رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

একজন মুসলিমের জন্য যা জানা অত্যাবশ্যকীয়

বাংলা | بنغالي | مَا لَا يَسَعُ المُسْلِمَ جَهْلُهُ

মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীর দ্বীনি বিষয় সম্পর্কিত প্রেসিডেন্সির একাডেমিক কমিটি

مَا لَا يَسَعُ المُسْلِمَ جَهْلُهُ

একজন মুসলিমের জন্য যা জানা অত্যাবশ্যকীয়

اللَّجْنَةُ العِلْمِيَّةُ

بِرِئَاسَةِ الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ بِالمَسْجِدِ الحَرَامِ وَالمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীর দ্বীনি বিষয় সম্পর্কিত প্রেসিডেন্সির একাডেমিক কমিটি

একজন মুসলিমের জন্য যা জানা অত্যাবশ্যকীয়

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের রব।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই ব্যক্তির ওপর, যিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন, এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার সুন্নাত অনুসরণ করে ও তার পথনির্দেশ গ্রহণ করে- তাদের সকলের ওপর। অতঃপর:

এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যাতে আক্বীদা, ইবাদত ও লেনদেন সম্পর্কিত মুসলিমদের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা এটি হারামাইন শরীফাইনের পুরুষ ও নারী যিয়ারতকারীদের জন্য সংকলন করেছি, যাতে তারা তাদের দ্বীনের বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান ও গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে পারেন। আমরা মহিমান্বিত ও করুণাময় আল্লাহর নিকট আশা করি- তিনি যেন এর দ্বারা উপকৃত করেন, এটিকে সৎকর্ম হিসেবে কবুল করেন এবং তা যেন একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়; নিশ্চয় তিনিই সর্বোত্তম প্রার্থিত সত্তা এবং সবচেয়ে আশার স্থান।

মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর দ্বীনি বিষয় সম্পর্কিত প্রেসিডেন্সির একাডেমিক কমিটি

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

***

প্রথম পরিচ্ছেদ:

আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

প্রথম অধ্যায়: ইসলাম (الإسلام) শব্দের অর্থ ও তার রুকনসমূহ:

ইসলাম হল: তাওহীদের সাথে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা এবং শিরক ও মুশরিক থেকে পবিত্র থাকা।

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

প্রথম: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া।

দ্বিতীয়: সালাত কায়েম করা

তৃতীয়: যাকাত প্রদান করা

চতুর্থ: রমজানের সিয়াম পালন করা

পঞ্চম: সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের পবিত্র বায়তুল্লায় হজ আদায় করা

তাওহীদের গুরুত্ব:

জেনে রাখুন! মহান আল্লাহ সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦﴾

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে।" [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬] আর ইলম বা জ্ঞানার্জন ব্যতীত এই ইবাদতগুলো জানা সম্ভব নয়। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ۝١٩﴾

"কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯] অত্র আয়াতে তিনি কথা ও আমলের পূর্বেই ইলম দ্বারা শুরু করেছেন। কাজেই একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক তা হল, তাওহীদ সম্পর্কিত জ্ঞান; কেননা তা দ্বীনের মূল ও এর বুনিয়াদ। তাওহীদ ব্যতীত দ্বীন ঠিক থাকতে পারে না, আর একজন মুসলিমের উপর এটিই প্রথম ও শেষ ওয়াজিব বিধান। আর তাওহীদ হল, ইসলামের প্রথম রুকন, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যা জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। বস্তুত ইসলামের রুকন পাঁচটি। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ».

(ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লায় হজ করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা।)[1]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তাওহীদের অর্থ জানা আবশ্যক; আর তা হল ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা। অতএব তাঁর সাথে কাউকে ইবাদতে শরীক করা যাবে না; না কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তা, না কোন প্রেরিত নবীকে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই- এই

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৮)।

সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হল:

বান্দা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই স্বীকৃতি প্রদান করবে যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই। কাজেই সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং দোয়া, ভয়, আশা, নির্ভরতা ইত্যাদি সকল ধরণের ইবাদতে তাকেই নির্দিষ্ট করবে।

এই সাক্ষ্য দুটি রুকন ব্যতীত বাস্তবায়িত হবে না:

এক: আল্লাহ ব্যতীত সকল ধরণের মূর্তি, প্রভু ও তাগুতের উলুহিয়্যাত ও ইবাদতকে অস্বীকার করা।

দ্বিতীয়: উলুহিয়্যাত ও প্রকৃত ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, তিনি ছাড়া আর কারো জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ...﴾

"আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এ নির্দেশ দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর... ।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তসমূহ, তা নিম্নরূপ:

এক: ইলম যা অজ্ঞতার পরিপন্থী।

দুই: দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহের পরিপন্থী।

তিন: ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা যা শিরকের পরিপন্থী।

চার: সত্যায়ন করা যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিপন্থী।

পাঁচ: ভালবাসা যা ঘৃণার বিপরীত।

ছয়: মান্য করা যা বর্জনের পরিপন্থী।

সাত: কবুল করা যা প্রত্যাখ্যান করার পরিপন্থী।

আট: আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করা।

এই শর্তগুলো অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। এগুলোকে নিচের (আরবী) কবিতার দুই লাইনে একত্রিত করা হয়েছে:

জ্ঞান, বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা, তোমার সত্যায়ন *** সাথে মহব্বত, আনুগত্য ও কবুল।

এগুলোর সাথে অষ্টম শর্তটি বাড়ানো হয়েছে- তা হল তোমার অস্বীকৃতি সেগুলোকে *** আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়।

এই সাক্ষ্যের বাস্তবায়ন হবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে যার কোন শরীক নেই এবং ইবাদতকে এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে। সুতরাং সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই কুরবানী করবে।

সুতরাং কিছু মানুষ যারা বিভিন্ন কবরের তাওয়াফ করে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরবাসীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে ও তাদের ডাকে- তা হলো ইবাদতে শির্ক করা। সুতরাং তা থেকে নিজে বেঁচে থাকা ও অন্যকে সতর্ক করা ওয়াজিব। কেননা তা মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যেসব মূর্তি, পাথর ও গাছপালার ইবাদত করত তারই নামান্তর। আর এটা এমন শিরক যা থেকে সতর্ক ও নিষেধ করার জন্য কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হল:

তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা, যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, যা থেকে নিষেধ বা সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি যা শরীয়তসিদ্ধ করেছেন তা দ্বারাই আল্লাহর ইবাদত করা। সুতরাং একজন মুসলিম স্বীকৃতি দিবে যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কুরাশী আল-হাশেমী মানব ও জীন জাতির সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا...﴾

“বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল... ।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৫৮]

আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বীনের তাবলীগ ও মানুষের হেদায়াতের জন্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨﴾

“আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৮] তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾

“আর আমি তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

আর এই সাক্ষ্যের দাবী হল, সে এমন বিশ্বাস করবে না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুবুবিয়্যাত ও বিশ্ব পরিচালনায় কোন হক রয়েছে, কিংবা ইবাদত পাওয়ার কোন হক আছে। বরং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বান্দা যার ইবাদত করা যায় না এবং একজন রাসূল যাকে অস্বীকার করা যায় না। এবং আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তিনি নিজের বা অন্যের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ...﴾

“বলুন , আমি তোমাদেরকে বলি না যে , আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আছে, আর আমি এও বলি না যে আমি গায়েব জানি এবং তোমাদের এও বলি না যে, আমি ফেরেস্তা, আমার প্রতি যা অহীরূপে প্রেরণ করা হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি... ।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫০]

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈমান (الإيمان) এর অর্থ ও রুকনসমূহ:

ঈমান হল, অন্তরের স্বীকৃতি, মৌখিক উচ্চরণ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমলের সমন্বয়; যা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার কারণে হ্রাস পায়।

সুতরাং ঈমান হল ইবাদত বিশুদ্ধ ও কবুল হওয়ার একটি শর্ত, যেমনভাবে শিরক ও কুফর সকল ইবাদতকে বিনষ্টকারী তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা অযু ব্যতীত সালাত কবুল করেন না, তেমনি তিনি ঈমান ব্যতীত কোন ইবাদত কবুল করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤﴾

“আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমন অবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৪]

তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, শিরক আমল বিনষ্টকারী। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾

“আর আপনার প্রতি ও আপনার পুর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [আয-যুমার, আয়াত: ৬৫]

ঈমানের রুকন ছয়টি: আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, রাসূলগণের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান।

১) আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা। এটি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১- তাঁর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান:

আর তা হল, আল্লাহকে তাঁর সকল কর্মে একক সাব্যস্ত করা; যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক প্রদান এবং জীবন ও মৃত্যু দান। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, আল্লাহ ব্যতীত কোন রিযিকদাতা নেই, আল্লাহ ব্যতীত ব্যতীত কোন জীবন ও মৃত্যু দানকারী নেই এবং একমাত্র মহান আল্লাহই এই বিশ্বজগত পরিচালনা করেন।

কোন মাখলূক মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত অস্বীকার করেছে বলে জানা যায় না, তবে কেউ যদি এমন অহঙ্কারী হয় যে তার নিজের কথাই বিশ্বাস করে না, তার কথা ভিন্ন। যেমনটি ঘটেছিল ফেরাউনের ক্ষেত্রে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল:

﴿...أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾

“...আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।” (সূরা আন-নাযি‘আত, আয়াত: ২৪)।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তার বিশ্বাস ছিল না, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন:

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾﴾

"মূসা বললেন, তুমি অবশ্যই জান যে, এসব স্পষ্ট নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের রবই নাযিল করেছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। আর হে ফির'আউন! আমি তো মনে করছি তুমি হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ১০২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا... ﴾

"আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল...।" [সূরা আন-নামাল, আয়াত: ১৪]

কেননা সমস্ত সৃষ্ট জীবের অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। যেহেতু এগুলো নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসতে পারে না; কেননা কোন কিছুই তার নিজ সত্ত্বাকে সৃষ্টি করতে পারে না, এবং তা আকস্মিকভাবে অস্তিত্বে আসাও সম্ভব নয়; কেননা প্রত্যেক ঘটনার জন্য একজন কার্য সম্পাদনকারী আবশ্যক। এছাড়াও এই বিস্ময়কর ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থায় তার অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে হয়ে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং তার একজন অস্তিত্বদানকারী থাকা অবধারিত, আর তিনিই হলেন আল্লাহ, যিনি সারা বিশ্বের রব। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾﴾

"তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?*

নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না।" [সূরা আত-তূর, আয়াত: ৩৫-৩৬]

মুশরিকরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাত স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে তাদেরকে তা ইসলামে দাখিল করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল মনে করেছেন; কেননা তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করেছিল। তারা আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করেছিল; মূর্তি, পাথর, ফেরেস্তা ইত্যাদির।

২- উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান:

উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমানের অর্থ হল: তিনিই একক সত্য ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। ইলাহ অর্থ হল (যার ইবাদত করা হয়) অর্থাৎ (মাবুদ) ভালবাসা প্রকাশ, সম্মান প্রদর্শন ও বশ্যতা স্বীকারের দিকে থেকে তিনিই একমাত্র ইলাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾

“আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৩]

যে কেউ আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কোনো ইলাহ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ ছাড়া তার উপাসনা করে, তার সেই উপাসনা বাতিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾﴾

“আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান।” [সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৬২]

তাই তো নূহ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত রাসূল তাদের সম্প্রদায়কে আল্লাহর তাওহীদ এবং কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদতের

দিকে আহবান করতেন। আর আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের বহু ইলাহ গ্রহণ ও আল্লাহর সাথে তাদের ইবাদত করা, তাদের নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা দু'টি যৌক্তিক দলিলের মাধ্যমে বাতিল করেছেন:

এক: তাদের গৃহীত এ সমস্ত ইলাহগুলোর মাঝে উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কেননা এগুলো মাখলুক, তারা সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের ইবাদতকারীদের কোন উপকার করতে পারে না, তাদের থেকে কোন ক্ষতি প্রতিহত করতে পারে না এবং তারা জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মালিকও নয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتٗا وَلَا حَيَوٰةٗ وَلَا نُشُورٗا ٣﴾

"আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আর মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩]

দুই: এ সমস্ত মুশরিকরা স্বীকার করত যে, আল্লাহ তায়ালাই হলেন একমাত্র স্রষ্টা ও পরিচালক, অন্যরা নয়। বস্তুত এর দাবি হল, উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রেও তাকে তারা একক সাব্যস্ত করবে যেমনভাবে তারা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্বকে স্বীকার করেছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ٨٩﴾

“বলুন, ‘যমীনে এবং এতে যা কিছু আছে এগুলো কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)।*

অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহর।’ বলুন, ‘তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?*

বলুন, ‘সাত আসমানের রব ও মহা-‘আরশের রব কে?’*

অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, ‘তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?*

বলুন, ‘কার হাতে সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান (তবে বল)।’*

অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, ‘তাহলে কোথা থেকে তোমরা যাদুগ্রস্থ হচ্ছো?” [আল-মু‘মিনূন, আয়াত: ৮৪-৮৯] যেহেতু তারা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করেছে, তাই তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে ইবাদতের ক্ষেত্রেও তাঁকে একক হিসেবে মেনে নেয়া এবং ইবাদতে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

৩- আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের প্রতি ঈমান:

অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় কিতাবে নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে তাঁর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন; সেসব নামসমূহ ও গুণাবলী, আল্লাহর জন্য উপযুক্তভাবে সাব্যস্ত করা। কোন প্রকার বিকৃতি, অকার্যকর করা ছাড়া এবং ধরন ও উপমা নির্ধারণ ছাড়াই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮০] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿...لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

“...কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

শিরক তিন প্রকার:

১- শিরকে আকবার বা বড় শিরক।

২- শিরকে আসগার বা ছোট শিরক।

৩- শিরকে খাফী বা গোপন শিরক।

১- শিরকে আকবার:

এর নীতিমালা হলঃ যে সব বৈশিষ্ট্য কেবল আল্লাহর সাথে খাস তাতে গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٨﴾

“যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের রব-এর সমকক্ষ গণ্য করতাম।” [সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ৯৮]

আর এর অন্তর্ভুক্ত হল: গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত পালন করা, অথবা ইবাদতের কিছু অংশ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে করা; যেমন: দোয়া, আশ্রয় প্রার্থনা, মান্নত, কুরবানী করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ইবাদত।

তা আরো অন্তর্ভুক্ত করে: মহান আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করা, বা যা হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা, বা আল্লাহ যা কিছু ওয়াজিব

করেছেন তা বাদ দেয়া। যেমন দ্বীনের মাঝে সুস্পষ্ট হারাম বিষয়গুলোকে হালাল মনে করা; উদাহরণস্বরূপ যিনা, মদ, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, সুদ ইত্যাদিকে হালাল মনে করা।

অথবা আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করা। বা আল্লাহ যা ওয়াজিব করেছেন তা বাদ দেয়া। যেমন এই বিশ্বাস করা যে, সালাত ওয়াজিব নয়, বা সওম ওয়াজিব নয়, বা যাকাত ওয়াজিব নয়।

শিরকে আকবার আমল বিনষ্ট হওয়া এবং এর উপর মৃত্যুবরণকারীর জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামকে আবশ্যক করে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

"...আর যদি তারা শিরক করত তবে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিস্ফল হয়ে যেত।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৮]

যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করবে; আল্লাহ তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তার জন্য জান্নাত হারাম। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ...﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না, আর এছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ...﴾

"নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম... ।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৭২]

2- শিরকে আসগার:

তা হল, দলিলের ভিত্তিতে যেগুলোর নামকরণ শিরক হিসেবে প্রমাণিত, কিন্তু তা শিরকে আকবারের পর্যায়ের নয়, এটিকে শিরকে আসগার বলা হয়। যেমন গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা; উদাহরণস্বরূপ: কাবাগৃহ, নবীগণ, আমানত, কোন ব্যক্তির জীবন ইত্যাদির নামে শপথ করা। যেমনটি নবী সাঃ বলেছেন:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَو أَشرَكَ».

(যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল সে কুফরী করল অথবা শিরক করল।)[1]

ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী অনেক সময় তা শিরকে আকবারে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং যদি নবী কিংবা কোন শায়খের নামে শপথকারী ব্যক্তির অন্তরে এমন বিশ্বাস থাকে যে, সে আল্লাহর মতই, বা আল্লাহ ব্যতীত তাকে ডাকা যায় কিংবা সে পৃথিবী পরিচালনা করে, তবে তা শিরকে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে গাইরুল্লাহর নামে শপথকারী যদি এমন উদ্দেশ্য না করে, বরং এ ধরণের নিয়ত ছাড়াই অভ্যাসের কারণে তার মুখে চলে আসে, তবে তা শিরকে আসগার হিসেবে গণ্য হবে। কিছু ক্ষেত্রে এটি অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়। সুতরাং তাওহীদের সংরক্ষণ ও হেফযতের জন্য তা থেকে সতর্ক থাকা ও ভীতি প্রদর্শন করা আবশ্যক।

৩- শিরকে খাফী:

তা হল, অন্তরের মাঝে বিদ্যমান রিয়া বা লৌকিকতা; যেমন মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় বা তেলাওয়াত করা, কিংবা এমনভাবে তাসবীহ পাঠ বা সাদকা করা যেন অন্যরা তার প্রশংসা করে। আর এটি শুধু যে আমলের মাঝে লৌকিকতার নিয়ত করেছে তা বিনষ্টকারী, বাকী অন্যান্য আমল যেগুলো

[1] মুসনাদে আহমাদ (হাদীস নং ৬০৭২) ও সুনানে তিরমিযী (হাদীস নং ১৫৩৫), তিনি বলেছেন: এটি হাসান হাদীস।

সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য আদায় করেছে সে গুলোকে নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلَةِ السَّودَاءِ عَلَى الصَّفَاةِ السَّودَاءِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ».

(নিশ্চয় শিরক অন্ধকার রাত্রীতে কালো পাথরের উপর কালো পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে এই উম্মতের মাঝে লুকিয়ে থাকে। আর এর কাফফারা হল এ দোয়া বলা:

অর্থ: হে আল্লাহ! জেনে শুনে কোন কিছুকে আপনার সাথে শরীক করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং না জেনে পাপ হয়ে গেলে তা থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।)[1]

কুফরের প্রকারভেদ:

প্রথম প্রকারঃ কুফরে আকবার বা বড় কুফর:

এই গোনাহটি চিরস্থায়ী জাহান্নামকে আবশ্যক করে, আর এটি পাঁচ প্রকার:

১- মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী:

তা হল রাসূলগণকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা। এ ধরণের কুফর কাফেরদের মাঝে কম রয়েছে; যেহেতু আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণকে সুস্পষ্ট দলীল দিয়ে সাহায্য করেছেন। বরং এসব মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা সেরূপ যেমনটি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন:

---

1 বুখারী, আদাবুল মুফরাদ (হাদীস নং ৭১৬), মুসনাদে আহমাদ (হাদীস নং ১৯৬০৬), যিয়া আল-মাকদাসীর আল-আহাদীসুল মুখতারা (১/১৫০), শাইখ আলবানী সহীহুল জামে আস-সগীরে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (হাদীস নং ৩৭৩১)।

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا...﴾

“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল...।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৪]

২- অস্বীকৃতি ও অহঙ্কারমূলক কুফরী:

যেমন ইবলিসের কুফরী, কেননা সে আল্লাহর আদেশকে অবিশ্বাস বা তার রিরোধিতা করেনি, বরং সে তা পালনে অস্বীকৃতি জানায় ও অহঙ্কার করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আমাকে সিজদা করো, তখন ইবলিশ ছাড়া সকলেই সিজদা করলো; সে অস্বীকার করলো ও অহংকার করলো। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৪]

৩- উপেক্ষামূলক কুফরী:

তা হল, সে তার শ্রবণশক্তি ও অন্তরকে হকের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে নিবে। ফলে সে এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না এবং তাতে কোন গুরুত্বও দেয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢﴾

“আর তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যাকে তার রবের

আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২২]

তবে আংশিক উপেক্ষা করা ফাসেকী, তা কুফরী নয়। যেমন ঐ ব্যক্তি যে দ্বীনের কিছু ওয়াজিব বিষয় শেখা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেমন সিয়াম, হজ ইত্যাদি

৪- সংশয়মূলক কুফরী:

তা হল, সে দ্বিধান্বিত থাকবে, হকের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে না, বরং তাতে সন্দেহ পোষণ করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝٣٥ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝٣٦﴾

“আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল নিজের প্রতি যুলুম করে। সে বলল, ‘আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে;*

আমি এও মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি আমার রব-এর কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবে আমি তো নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৩৫-৩৬]

৫- নিফাকীমূলক কুফরী:

তা হল, সে মুখে ঈমান প্রকাশ করবে, কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨﴾

“আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি’, অথচ তারা মুমিন নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ,

আয়াত: ৮]

এগুলো হল কুফরে আকবারের প্রকার যা একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার: কুফরে আসগার বা ছোট কুফর:

এ ধরণের কুফরী ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামকে আবশ্যক করে না। তা হল, কুরআন ও সুন্নাহতে যেগুলোকে কুফর হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, তবে তা আলিফ ও লাম দ্বারা (معرفة) বা নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং তা এসেছে (نكرة) বা অনির্দিষ্ট হিসেবে। এর উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে: আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

(মানুষের মাঝে দুটি স্বভাব রয়েছে, যে দুটি তাদের ভেতর কুফর বলে গণ্য: বংশের বদনাম করা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।)[1]

২- ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান:

তারা অদৃশ্য জগতের অধিবাসী, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারা আল্লাহর ইবাদতকারী, তাদের রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে। তাদের সংখ্যা অগণিত, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত সংখ্যা কেউ জানে না।

ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১- তাদের অস্তিত্বের বিষয়ে ঈমান।

[1] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১২১), মুসনাদে আহমাদ (হাদীস নং ১০৪৩৪)।

২- তাদের মধ্য হতে যাদের নাম আমরা জানি তাদের উপর ঈমান আনা; যেমন জিবরাইল, ইসরাফীল, মিকাইল ইত্যাদি। আর যাদের নাম আমরা জানি না তাদের বিষয়েও আমরা সামগ্রিক ঈমান রাখব।

৩- কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত তাদের যেসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানি সেগুলোর বিষয়ে ঈমান। যেমন জিবরাইলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জিবরাইলকে আল্লাহ যে বৈশিষ্ট্যের উপর সৃষ্টি করেছেন সেভাবে দেখেছেন, তার ছয়শটি ডানা ছিল, যা আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত ঢেকে রেখেছিল।

৪- তাদের যে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে আমরা জেনেছি তার প্রতি ঈমান। যেমন আল্লাহর তাসবীহ পাঠ এবং দিন-রাত কোন প্রকার ক্লান্তি ও বিরতি ছাড়াই তাঁর ইবাদত করা।

উদাহরণস্বরূপ: জিবরাইল ওহীর বার্তা বাহক।

আর ইসরাফীল: সিংগায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

মালাকুল মাউত: মৃত্যুর সময় জান কবজের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

মালেক: জাহান্নামের প্রহরী। রিদওয়ান: জান্নাতের প্রহরী ও অন্যান্য ফেরেস্তাগণ।

৩- কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান:

কিতাবসমূহ বলতে উদ্দেশ্য হল: সে সমস্ত আসমানী কিতাব যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। মানব জাতিকে হেদায়াতের জন্য ও তাদের প্রতি রহমত স্বরূপ, যেন তারা উভয় জগতে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১- এই ঈমান রাখা যে, এগুলো প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

২- যে সমস্ত কিতাবের নাম আমরা জেনেছি সেগুলোর প্রতি ঈমান রাখা; যেমন কুরআন যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাওরাত যা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, ইনজিল যা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে ও যাবুর যা দাউদ আলাইহিস সালামকে প্রদান করা হয়েছিল।

আর যে সমস্ত কিতাবের নাম আমরা জানি না; সেগুলোর প্রতিও সামগ্রিকভাবে ঈমান রাখব।

৩- তাতে যেসব বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছে সেগুলোকে সত্যায়ন করা; যেমন কুরআনের সংবাদসমূহ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে যেগুলো পরিবর্তন করা হয়নি তার সংবাদসমূহ।

৪- এগুলোর মধ্য হতে যেসব আহকাম মানসূখ হয়নি তার উপর আমল করা, সেগুলোর উপর সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে চলা; চাই আমরা তার হিকমত অনুধাবন করি কিংবা না করি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে পূর্ববতী সকল কিতাবকে মানসূখ করা হয়েছে, কাজেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন বিধানের প্রতি আমল করা জায়েয নয়, তবে যেগুলো বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে ও কুরআন ও নবীর সুন্নাত তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলো ছাড়া।

৪- সমস্ত রাসূল আলাইহিমুস সালাম এর প্রতি ঈমান:

আরবী রাসূল (رسول) শব্দের বহু বচন হল রুসুল(الرسل); রাসূল হলেন, আল্লাহ যে মানুষের প্রতি শরীয়তের অহী করেছেন এবং তা প্রচারের আদেশ দিয়েছেন। তাদের প্রথমজন হলেন নূহ আলাইহিস সালাম ও সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা সকলেই সৃষ্ট মানব ছিলেন, তাদের রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের অন্তর্গত হচ্ছে:

১- এই ঈমান রাখা যে তাদের রিসালাত আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য,

সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের একজনের রিসালাতকে অস্বীকার করল, সে সকলের রিসালাতকে অস্বীকার করল।

২- তাদের মধ্য হতে যাদের নাম আমরা জেনেছি তাদের প্রতি ঈমান রাখা। যেমনঃ মুহাম্মাদ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, নূহ আলাইহিমুস সালাম; তারা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূল।

আর যে সমস্ত রাসূলের নাম আমরা জানি না; তাদের প্রতিও সামগ্রিকভাবে ঈমান রাখব। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ...﴾

"আর অবশ্যই আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের কারো কারো কাহিনী আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কাহিনী আপনার কাছে বিবৃত করিনি...।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৭৮]

৩- তাদের যেসব ঘটনা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা সত্যায়ন করা।

৪- তাদের মধ্য হতে যাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে তার শরীয়তের প্রতি আমল করা, আর তিনি হলেন সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫) পরকালের প্রতি ঈমান:

তা হল কিয়ামত দিবস, যেদিন মানুষদেরকে হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদান প্রদানের জন্য পুনরুত্থিত করা হবে। এই দিনকে শেষ দিবস বলা হয়, কারণ এর পরে আর কোন দিন নেই, যেহেতু জান্নাতিরা জান্নাতে ও জাহান্নামীরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

পরকালের প্রতি ঈমান তিনটি বিষয়কে শামিল করে:

ক- পুনরুত্থানে বিশ্বাস:

তা হল, শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁ দেয়ার সময় মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়া। ফলে মানুষেরা বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হবে জুতা বিহীন খালী পায়ে, অনাবৃত অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে ও খাতনা বিহীন অবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٤﴾

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সুচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার প্রতিশ্রুতি, আর আমি তা পালন করবই।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪)।

খ- হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদান প্রদানে বিশ্বাস:

সেখানে বান্দার আমলের হিসাব নেয়া হবে ও তার প্রতিদান দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ٢٦﴾

"নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমারই কাছে;*

তারপর তাদের হিসেব-নিকেশ আমারই কাজ।" [সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ২৫-২৬]

গ- জান্নত ও জাহান্নামে বিশ্বাস:

এ দুটি মানুষের চিরস্থায়ী পরিণতি; জান্নাত হল নিয়ামতের আবাস যা আল্লাহ তায়ালা মুমিন, মুত্তাকী এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। এতে রয়েছে এমন সব জিনিস যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের অন্তরে ধারণাও জন্মেনি।

পক্ষান্তরে জাহান্নাম; তা হল, আযাবের নিবাস, যা আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন কাফেরদের জন্য; যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে ও রাসূলগণের

অবাধ্য হয়েছে। এতে বহু ধরণের আযাব ও শাস্তি রয়েছে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান:

তাকদীর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: মহান আল্লাহ কর্তক নির্ধারিত বিষয়, যা ভবিষ্যতে ঘটবে তাঁর পূর্ব ইলম ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী।

তাকদীরের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১- ইলম: তা হল আল্লাহর ইলমের বিষয়ে ঈমান, যা কিছু হয়েছে, যা হবে, কিভাবে হবে তিনি চিরস্থায়ীভাবে তার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সবই জানেন। যা কিছু সংঘটিত হয় নাই তা সংঘটিত কিভাবে হবে সে সম্পর্কেও তিনি জানেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَوۡ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ ...﴾

"আর তাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরৎ পাঠানো হলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত...।" [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ২৮]

২- লিপিবদ্ধকরণ: তা হল আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত অবধি সকল বিষয়ের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠﴾

"আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। এসবই তো আছে এক কিতাবে; নিশ্চয় তা আল্লাহ্র নিকট অতি সহজ।" [সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৭০]

৩- ইচ্ছা: তা হল এ ঈমান রাখা যে, এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহর

ইচ্ছায় ঘটছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ ...﴾

“আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন ও মনোনীত করেন...” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮] মানুষের ইচ্ছা রয়েছে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

“আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন।” [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৯]

৪- সৃষ্টি করা: তা হল এই ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের ভাল-মন্দ সকল আমল ও কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢﴾

“আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২]

এই স্তরগুলোকে নিম্ন বর্ণিত (আবরী) কবিতাংশে একত্রিত করা হয়েছে:

(ইলম, আমাদের মাওলার লিপিবদ্ধকরণ, তাঁর ইচ্ছা*** এবং সৃষ্টি করা, আর তা হল অস্তিত্ব দেয়া ও গঠন করা।)

তৃতীয় অধ্যায়: ইহসান প্রসঙ্গ:

ইহসান: এর একটিমাত্র রুকন, তা হচ্ছে: তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন (এটি স্মরণে রেখে ইবাদত করবে)।

অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর ইবাদত পালনের সময় একথা মনে করবে যে, সে যেন

মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এটি তাকে পূর্ণরূপে ভয় করা ও তাঁর দিকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তন করাকে আবশ্যক করে, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত পালন করাকে আবশ্যক করে।

ইহসান দু'টি স্তরের এবং ইহসান পালনকারীগণ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের:

প্রথম পর্যায়: আর এটি সর্বোচ্চ পর্যায়, মুশাহাদার পর্যায়; তা হল, বান্দা এমনভাবে আমল করবে যেন সে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখছে। ফলে তার অন্তর ঈমান দ্বারা আলোকিত হবে, এমনকি তার নিকট গায়েবের বিষয়কে চাক্ষুষ বলে মনে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: ইখলাস ও তত্ত্বাবধানের পর্যায়, তা হল, বান্দা এমনভাবে ইবাদত করবে যেন আল্লাহ তাকে অবলোকন ও পর্যাবেক্ষণ করছেন। যখন সে এরূপ মনে করবে, তখন সে আল্লাহর জন্য মুখলেসভাবে আমল করবে।

চতুর্থ অধ্যায়: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রকাশ্যে ও গোপনে অনুসরণ করা, এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কথার উপর কোন মানুষের কথাকে প্রাধান্য না দেয়া।

দ্বিতীয়ত: রাসূল সাঃ এর সাহাবীদের ব্যাপারে নিজেদের অন্তর ও জিহবাকে নিরাপদ রাখা। তারা বিশ্বাস করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খলিফা হলেন: আবু বকর, অতঃপর উমর, তারপর উসমান, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

তৃতীয়ত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতকে মহব্বত করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত হলেন: বিশেষত তাদের মধ্য হতে সৎকর্মশীলগণ।

চতুর্থত: ইমাম ও শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, যদিও তারা যুলুম করে। তাদের সংশোধন ও যথার্থতার জন্য দোয়া করা, তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া না করা, এবং আল্লাহর আনুগত্যের কাজে তাদেরকে মান্য করা ফরয, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পাপ কাজের আদেশ না দেয়। তবে যদি তারা পাপকাজের আদেশ দেয়, তবে সে বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যাবে না, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য যথাযথ বহাল থাকবে।

পঞ্চমত: অলী-আওলিয়ার কারামতকে বিশ্বাস করা; তা হল, আল্লাহ তায়ালা তাদের মাধ্যমে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

ষষ্ঠত: সাধারণ পাপ ও কবিরা গুনাহের কারণে তারা মুসলিমদেরকে কাফের মনে করেন না। যেমনটি খারেজী সম্প্রদায় করে থাকে। বরং পাপ করলেও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে। পাপী সম্পর্কে তারা বলেন: সে তার ঈমানের মাধ্যমে মুমিন, তবে কবিরা গুনাহের কারণে ফাসিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

প্রথম অধ্যায়: পবিত্রতা প্রসঙ্গ:

তাহারাতের আভিধানিক অর্থ: বাহ্যিক ও আত্মিক আবর্জনা থেকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

শরয়ী পরিভাষায়: অপবিত্রতা দূর করা ও নাজাসাত অপসারণ করা। পবিত্রতা হল সালাতের চাবি। কাজেই তা সম্পর্কে জানা দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; প্রত্যেক মুসলিমের যে বিষয়ে জ্ঞান রাখা ও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

প্রথমত: পানির প্রকারভেদ:

১- পবিত্র পানি; যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বিশুদ্ধ হবে, চাই তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর অবিচল থাক; যেমন, বৃষ্টির পানি ও নদী-নালার পানি, কিংবা তার সাথে পবিত্র কোন জিনিস মিশ্রিত হয়েছে কিন্তু তা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে

পারেনি এবং তার নামও পরিবর্তন হয়নি।

২- অপবিত্র পানি; যা ব্যবহার করা জায়েয নয়। সুতরাং তা অপবিত্রতা দূর করতে পারে না, এবং নাজাসাত অপসারণ করতেও পারে না। তা হল, নাজাসাত মিশ্রিত হওয়ার ফলে যে পানির রং, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত: নাজাসাত:

নাজাসাত হল নির্দিষ্ট ময়লা, যা সালাতকে বাধাগ্রস্থ করে। যেমন পেশাব, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। আর তা শরীর, স্থান ও পোশাকেও থাকতে পারে।

প্রত্যেক বস্তুর মূল হল: বৈধ ও পবিত্র হওয়া। সুতরাং কেউ কোন বস্তুকে নাজাসাত হিসেবে সাব্যস্ত করতে চাইলে, তার স্বপক্ষে দলীল দিতে হবে। শ্লেষ্মা, মানুষের ঘাম, গাধার ঘাম নাজাসাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তা পবিত্র যদিও তা নোংরা। প্রত্যেক নাজাসাতই নোংরা, কিন্তু প্রত্যেক নোংরা জিনিস নাজাসাত নয়।

নাজাসাত তিন ধরণের:

এক: নাজাসাতে মুগাল্লাযা তথা চরম নাজাসাত;

যেমন: কুকুুরের লেহন করা বস্তুর নাজাসাত, তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল: সে বস্তুকে সাতবার ধৌত করতে হবে যার প্রথমবার মাটি দিয়ে।

দুই: হালকা নাজাসাত:

যেমন: দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাব যখন কোন কাপড় ইত্যাদিতে লেগে যায়। তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল: তার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছিটিয়ে দিতে হবে, তা মর্দন করা বা নিংড়ানোর প্রয়োজন নেই।

তিন: মধ্যম পর্যায়ের নাজাসাত:

যেমনঃ মানুষের পেশাব, পায়খানা ও অধিকাংশ নাজাসাত যখন তা যমীন, কাপড় ইত্যাদির উপর পতিত হয়। তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল: যদি নাজাসাতের আকার থাকে তবে তা দূর করতে হবে এবং তা পানি বা পরিচ্ছন্ন করার অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

যে সমস্ত বস্তু নাজাসাত হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে সেগুলো হল:

১- মানুষের পেশাব ও পায়খানা।

২- মযী ও ওদী।[1]

৩- যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় না তার বিষ্ঠা।

৪- হায়েয ও নিফাসের রক্ত।

৫- কুকুরের লালা।

৬- মৃত, তবে এর ব্যতিক্রম হল:

ক- মৃত মানুষ।

খ- মৃত মাছ ও পঙ্গপাল।

গ- দেহে প্রবাহিত রক্ত নেই এমন প্রাণীর মৃত দেহ; যেমন মাছি, পিপিলিকা, মৌমাছি ইত্যাদি।

ঘ-মৃত প্রাণীর হাড়, শিং, নখ, চুল ও পালক।

এই ধরণের নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি হবে:

১- পানি দ্বারা, পানি হল নাজাসাতকে পবিত্র করার মূল উপাদান। সুতরাং পানি বাদ দিয়ে অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না।

২- শরীয়তে যে সমস্ত নাজাসাত বা নাপাক বস্তু পবিত্রকরণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

ক- মৃত প্রাণীর চামড়া পবিত্র করতে হয় দাবাগাত দিয়ে।

খ- যে পাত্র কুকুর লেহন করেছে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল: এমন পাত্র সাতবার ধৌত করতে হবে যার প্রথমবার মাটি দিয়ে।

---

[1] মযী: পাতলা, বর্ণহীন পানি যা যৌন রসিকতার সময়, সহবাসের কথা মনে হলে বা ইচ্ছা করলে, অথবা (যৌন দৃশ্য) দেখলে ইত্যাদি সময় বের হয়। এটি ফোঁটায় ফোঁটায় বের হতে পারে এবং অনেক সময় তা অনুভব নাও হতে পারে।

ওদী: ঘন সাদা পানি যা প্রস্রাবের পর বা ভারী কিছু বহনের সময় বের হয়।

গ- যে কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায় তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, প্রথমে মর্দন করা, অতঃপর সেটাকে পানি দ্বারা ঘসা দেয়া, সবশেষ তার উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া, এরপরও যদি এর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তাতে সমস্যা নেই।

ঘ- নারীর আঁচল পবিত্র করার পদ্ধতি হল; অপবিত্র স্থানের পরবর্তী পবিত্র মাটি।

ঙ- দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব থেকে কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি হল; ছেলে শিশু হলে পানির ছিঁটা দেয়া, আর মেয়ে শিশু হলে ধৌত করা।

চ- মযী থেকে কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি হল; নির্দিষ্ট স্থানে পানির ছিটা দিতে হবে।

ছ- জুতার নিচের অংশ পবিত্র করার পদ্ধতি হল; পবিত্র মাটিতে তা ঘসে নেয়া।

জ- নাজাসাত থেকে যমীন পবিত্র করার পদ্ধতি হল; সে নির্দিষ্ট স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া, বা রোদ কিংবা বাতাসে শুকিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে দেয়া। অতপর যখন নাজাসাতের চিহ্ন দূর হয়ে যাবে তখন তা পবিত্র হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত: অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত কাজ করা হারাম:

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত কাজ করা হারাম তা নিম্নরূপ, বড় অবিত্রতা বা ছোট অপবিত্রতা যাই হোক:

১- ফরজ বা নফল সালাত আদায় করা; কেননা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ».

"আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবুল করেন না।"[1]

[1] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৪)।

২- কুরআন স্পর্শ করা; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন হাযমকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে রয়েছে:

«لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউই কুরআনকে স্পর্শ করবে না।"[1]

৩- বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ».

"বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা সালাতের ন্যায়, তবে এ সময় কথা বলা আল্লাহ হালাল করেছেন (যা সালাতে হারাম)।"[2] আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের জন্য অযু করেছেন। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ঋতুবতী নারীকে পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন।

আর বিশেষ করে হাদাসে আকবার বা বড় অপবিত্রতা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো হল:

১- কুরআন পাঠ করা; কেননা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে: "একমাত্র জানাবাত ব্যতীত কোন কিছুই তাকে -অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু

---

1 'মুয়াত্তা' মালেক (হাদীস নং ৬৮০ ও ২১৯), সুনানে দারেমি (হাদীস নং ৩১২), 'মুসান্নাফে' আবদুর রাজ্জাক (হাদীস নং ১৩২৮)। শাইখ আলবানি 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে (হাদীস নং ১২২) এটিকে সহীহ বলেছেন।

2 সুনানে নাসায়ী (হাদীস নং ১২৮০৮) ও মুসনাদে আহমাদ (হাদীস নং ১৫৪২৩)। শাইখ আলবানি 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে (হাদীস নং ১২১) এটিকে সহীহ বলেছেন।

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে- কুরআন থেকে বিরত রাখতে পারত না।”[1]

২- অযু ছাড়া মসজিদে অবস্থান করা; কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ...﴾

“হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও ...।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৩]

কাজেই যে ব্যক্তি বড় অবিত্র অবস্থায় আছে, সে যদি ওজু করে তবে তার জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ। অনুরূপভাবে বড় অবিত্র অবস্থায় পতিত ব্যক্তির জন্য অবস্থান করা ছাড়াই মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করা বৈধ।

চতুর্থত: পেশাব-পায়খানার আদবসমূহ:

পেশাব-পায়খানার করার ক্ষেত্রে উত্তম হল:

১- লোকজন থেকে দূরে যাওয়া ও আড়াল হওয়া।

২- টয়লেটে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট দোয়া বলা, তা হল:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

উচ্চারণ “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ।”

অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র নর ও নারী জিন থেকে আশ্রয় চাই।)[2]

---

1 সুনানে ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ৫৯৪) ও সহীহ ইবনে হিব্বান (হাদীস নং ৭৯৯)। শাইখ আলবানি 'যঈফ সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে (হাদীস নং ১৪৬) এটিকে যঈফ বলেছেন।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৪২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১২২)।

পেশাব-পায়খানা করার সময় ওয়াজিব হল:

১- পেশাব থেকে বেঁচে থাকা।

২- লজ্জাস্থান ঢাকা।

পেশাব-পায়খানা করার সময় হারাম হল:

১- কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা।

২- মানুষের চলাচলের রাস্তা বা সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত স্থানে পেশাব-পায়খানা করা।

৩- আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা।

পেশাব-পায়খানা করার সময় মাকরূহ হল:

১- পেশাব-পায়খানা করার সময় ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা।

২- ডান হাত দ্বারা ইস্তেনজা করা বা ঢিলা ব্যবহার করা।

৩- পেশাব-পায়খানা করার সময় কথা বলা, বিশেষত আল্লাহর যিকির করা মাকরূহ।

পঞ্চমত: ইস্তেনজা করা ও ঢিলা ব্যবহারের বিধানসমূহ:

ইস্তেনজা হল: পানি দ্বারা উভয় রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তুর চিহ্ন দূরীভূত করা।

ঢিলা ব্যবহার বলতে বুঝায়: পানি ব্যতীত অন্য বস্তু যেমন পাথর, টিস্যু দ্বারা উভয় রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তুর চিহ্ন দূরীভূত করা।

ঢিলা হিসেবে ব্যবহৃত বস্তুর জন্য শর্তসমূহ:

১- সেটা অনুমোদিত বস্তু হতে হবে।

২- সেটাকে পবিত্র হতে হবে।

৩- পরিচ্ছন্নকারী হতে হবে।

৪- সেটা হাড় কিংবা গোবর হতে পারবে না।

৫- সেটা সম্মানিত বস্তু হতে পারবে না; যেমন, এমন কাগজ যাতে আল্লাহর

নাম লেখা থাকে।

দুটি শর্ত সাপেক্ষে ঢিলা ব্যবহারই যথেষ্ট হবে:

১- উভয় রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু তার স্বাভাবিক স্থানের বাইরে ছড়িয়ে যাবে না।

২- তিন বা ততোধিক পরিষ্কারকারী পাথর ব্যবহার করতে হবে।

ষষ্ঠত: অযুর বিধানসমূহ

তিন ধরণের ইবাদতের জন্য অযু করা ওয়াজিব:

১- সালাত; ফরজ হোক বা নফল হোক।

২- কুরআন স্পর্শ করা।

৩- তাওয়াফ করা।

অযুর শর্তসমূহ:

১- ইসলাম।

২- বিবেক-বুদ্ধি

৩- ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা।

৪- নিয়ত: তার স্থান হল অন্তর, মুখে উচ্চরণ করা বিদআত। আর যে ব্যক্তি অযুর ইচ্ছা করল সে-ই নিয়ত করে। কিন্তু অযুর অঙ্গগুলোকে ঠান্ডা কিংবা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ধৌত করা অযু হিসেবে গণ্য নয়।

৫- এর হুকুমকে অব্যাহত রাখা: অর্থাৎ অযু পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা ভঙ্গ না করার নিয়ত রাখা।

৬- অযু ভঙ্গকারী বিষয় থেকে দূরে থাকা, তবে এর ব্যতিক্রম হল এরা: যার বহুমূত্রীয় রোগ রয়েছে এবং মুস্তাহাযা রোগাক্রান্ত নারীগণ।

৭- যার পূর্বে পেশাব বা পায়খানা হয়েছে তার জন্য ইস্তেনজা করা বা ঢিলা ব্যবহার করা।

৮- পানির পবিত্রতা ও বৈধ হওয়া।

৯- চামড়াতে পানি প্রবেশে বাধা দেয় এমন জিনিস দূর করা।

১০- যে লোক সর্বদা অপবিত্র থাকে তার ক্ষেত্রে সালাতের সময় হওয়া।

অযুর ফরযসমূহ:

১- মুখমন্ডল ধৌত করা, এর অন্তর্ভুক্ত হল, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

২- উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।

৩- সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা, এর অন্তর্ভুক্ত হল উভয় কান।

৪- টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

৫- অযুর অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৬- অবিচ্ছিন্নতা: সুতরাং অযুর অঙ্গগুলো একটি থেকে অপরটি ধৌত করার মাঝে দীর্ঘ সময় বিরতি দিবে না।

অযুর পদ্ধতি:

১- বিসমিল্লাহ বলা।

২- উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৩- মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করা, এর অন্তর্ভুক্ত হল, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

৪- উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। প্রথমে ডান হাত ধৌত করা অতঃপর বাম হাত।

৫- উভয় কানসহ মাথা মাসাহ করা।

৬- টাখনুসহ উভয় পা তিনবার ধৌত করা। প্রথমে ডান পা ধৌত করা অতঃপর বাম পা।

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ:

১- উভয় রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়া, যেমনঃ পেশাব, বায়ু ও পায়খানা।

২- শরীর থেকে কোন চরম নাপাক বস্তু নির্গত হওয়া।

৩- ঘুম বা অন্য কোন কারণে বিবেক লোপ পাওয়া।

৪- কোন আবরন ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, সামনের লজ্জাস্থান হোক বা পিছনের লজ্জাস্থান।

৫- উটের গোশত খাওয়া।

৬- ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া, আমাদেরকে ও সকল মুসলিমদেরকে আল্লাহ এ থেকে রক্ষা করুন।

সপ্তমত: চামড়া ও কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ করার বিধান:

১- খুফ্ (الخف) হল: পায়ে পরিহিত চামড়া বা এ জাতীয় বস্তুর মোজা।

২- জাওরাব (جورب) হলঃ পায়ে পরিহিত পশম বা সূতা বা এ জাতীয় বস্তুর মোজা।

এ উভয়টির উপর মাসাহ করার শর্তসমূহ:

১- পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের পর তা পরিধান করা।

২- উভয় পাকে টাখনু পর্যন্ত আবৃত করা।

৩- উভয়টির পবিত্র হওয়া।

৪- মাসাহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হওয়া।

৫- মাসাহ শুধুমাত্র অযুর ক্ষেত্রে হওয়া, গোসলের ক্ষেত্রে নয়।

৬- মোজাটি বা অনুরূপ জিনিসটি বৈধ হওয়া, সুতরাং যদি তা ছিনতাই করা হয় বা পুরুষের জন্য রেশমের মোজা হয়, তবে তার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা রুখসাত বা অনুমোদন কোন হারাম বিষয়কে বৈধতা দিতে পারে না।

মাসাহের সময়সীমা:

মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত।

মাসাহ করার পদ্ধতি:

পানি দিয়ে হাত ভিজিয়ে নিবে এবং পায়ের আঙ্গুল থেকে নলা পর্যন্ত চামড়ার

বা কাপড়ের মোজার উপরের অংশে একবার মাসাহ করে নিবে।

মাসাহ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

১- নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়া।

২- উভয় বা একটি মোজা খুলে ফেলা।

৩- হাদাসে আকবার বা বড় নাপাকিতে পতিত হওয়া।

মোজার উপর মাসাহ করার হুকুম:

এটি একটি ছাড়, আর তা গ্রহণ করা মোজা খুল ফেলা ও পা ধৌত করার চেয়ে উত্তম; আল্লাহর ছাড় গ্রহণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও বিদআতীদের বিরোধিতা করণার্থে।

৩- পট্টি, ব্যান্ডেজ ও প্লাস্টারের উপর মাসাহ করা:

পট্টি (الجبائر) হল, ভাঙ্গা অঙ্গের উপর যা কিছু বাঁধা হয়; প্লাস্টার, কাঠি ইত্যাদি।

ব্যান্ডেজ (العصائب) হল: ক্ষত, থেঁতলানো বা পোড়া অঙ্গের উপর যে কাপড় বা এ জাতীয় জিনিস বাঁধা হয়।

প্লাস্টার (اللصوق) হল: ক্ষত বা ফোসকার উপর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যা কিছু লাগানো হয়।

এগুলোর উপর মাসাহ করার হুকুম:

জায়েয: যখন তা বেঁধে রাখা প্রয়োজন হয়, তবে শর্ত হল প্রয়োজনীয় স্থান অতিক্রম করবে না।

জায়েয নয়: যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় বা তা খুলে ফেলায় কোন কষ্ট বা ক্ষতি না হয়।

এর উপর মাসাহ করার পদ্ধতি:

তার আশপাশের স্থানগুলো ধৌত করবে অতঃপর তার উপর সকল দিক থেকে মাসাহ করবে। অযুর স্থানের বাইরের জায়গায় মাসাহ করবে না।

অষ্টমত: তায়াম্মুমের বিধিবিধান

তায়াম্মুম হল: পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমন্ডল ও দু হাতের কব্জি মাসাহ করা।

এর হুকুম:

পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে, অযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা ওয়াজিব।

তা শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার হিকমত হলো:

তায়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মাদীর একটি বৈশিষ্ট্য, পূর্ববর্তী উম্মতে তা প্রচলিত ছিল না, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এই উম্মতের উপর প্রশস্ততা, তাদের উপর তাঁর রহমত স্বরূপ।

যেসব অবস্থায় তায়াম্মুম শরীয়তসিদ্ধ:

১- পানি না পাওয়া; চাই তা নিজ এলাকায় হোক কিংবা সফরে, যদি তালাশ করার পরও পানি না পায়।

২-যখন তার সাথে এমন পানি থাকে যা পান করা বা রান্না করার জন্য প্রয়োজন; যদি সে ঐ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে তবে তার প্রয়োজন বাধাগ্রস্ত হবে। যেমন সে নিজে পিপাসিত হওয়া বা অন্য মানুষের পিপাসিত হওয়া বা কোন পবিত্র প্রাণীর পিপাসিত হওয়ার আশঙ্কা করে।

৩- যদি পানি ব্যবহারে তার শরীরিক ক্ষতির আশঙ্কা করে; তার রোগের কিংবা রোগমুক্তি বিলম্ব হওয়ার দরুন।

৪- যখন সে অসুস্থতার কারণে চলাফেরা করতে না পারায় পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয়, এবং তাকে অযু করিয়ে দেয়ার কেউ না থাকে, আর সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে।

৫- যদি পানি ব্যবহারে ঠান্ডাজনিত সমস্যার আশঙ্কা করে এবং পানি গরম করার মতো কিছু না পায়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি:

সে তার দুই হাত আঙ্গুল খোলা রেখে মাটিতে একবার মারবে, তারপর আঙ্গুলের অভ্যন্তরীণ অংশ দ্বারা তার মুখমন্ডল মাসাহ করবে এবং দুই হাতের তালু দ্বারা কব্জি মাসাহ করবে। এ ক্ষেত্রে পুরো মুখমন্ডল ও দুই কব্জি মাসাহ করবে।

তায়াম্মুম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

১- পানির উপস্থিতি, যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে থাকে। অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষমতা, যদি পানি ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে তায়াম্মুম করে থাকে।

২- অযু ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘটলে অথবা জানাবাত, হায়েয বা নেফাসের কারণে গোসল ওয়াজিব হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

পানি ব্যবহার ও তায়াম্মুম করতে অপারগ ব্যক্তির হুকম:

পানি, মাটির কোনটিই পাওয়া না গেলে কিংবা চামড়ায় পানি বা মাটি স্পর্শ করতে অক্ষমতার পর্যায়ে পৌছালে, সে তার অবস্থা অনুযায়ী অযু, তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করবে; কেননা আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। আর যদি পরবর্তীতে পানি বা মাটি পায়, কিংবা তা ব্যবহারে সক্ষম হয়, সে পুনরায় সালাত আদায় করবে না। কারণ, সে তাই করেছে তাকে যা আদেশ করা হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ...﴾

‘অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।...” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

“আর আমি তোমাদেরকে যে আদেশ দিয়ে থাকি তা তোমরা সাধ্য অনুযায়ী

পালন কর।”[1]

ফায়েদা: যদি জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করে অতঃপর পানি পায়, তবে সে অবশ্যই গোসল করে নিবে।

নবমত: হায়েয ও নিফাসের বিধান

প্রথম: হায়েয:

এটি স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত রক্ত যা নির্দিষ্ট সময়ে নারীর জরায়ুর তলদেশ থেকে নির্গত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রতিমাসে ছয় বা সাত দিন নির্গত হয়, তবে এর কম-বেশিও হতে পারে। নারীর ঋতুকাল দীর্ঘ বা স্বল্প হতে পারে; আল্লাহ তায়ালা তাকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তার উপর ভিত্তি করে।

ঋতুবতী নারীর বিধান:

১- ঋতুবতী নারী ঋতু চলাকালীন সালাত ও সিয়াম পালন করবে না, আদায় করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না।

২- সে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সিয়াম কাজা করবে কিন্তু সালাত কাজা করবে না।

৩- তার জন্য বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা জায়েয নয়, সে কুরআন তেলাওয়াত করবে না, এবং সে মসজিদে বসবে না। ৪- হায়েয শেষ হলে গোসল না করা পর্যন্ত তার স্বামীর জন্য তার লজ্জাস্থানে সহবাস করা হারাম।

৫- তার স্বামীর জন্য সহবাস ব্যতীত অন্যভাবে উপভোগ করা জায়েয, যেমন চম্বুন করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি।

৬- হায়েয অবস্থায় তার স্বামীর জন্য তাকে তালাক দেয়া বৈধ নয়।

তুহুর বা পবিত্রতা হল, রক্ত নির্গত হওয়া থেমে যাওয়া। সুতরাং যখন রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে; তখন তার হায়েযের সময় শেষ হয়ে যাবে,

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৭২৮৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৬০৬৬)।

এমতবস্থায় তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব, তারপর তার থেকে হায়েযের কারণে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো রহিত হয়ে যাবে।

যদি পবিত্র হওয়ার পর মেটে বা হলুদ রং দেখতে পায়; তবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

দ্বিতীয়ত: নিফাস:

এটি সন্তান জন্ম ও তৎপরবর্তীতে জরায়ু থেকে নির্গত রক্ত, মূলত এটি ঐ রক্ত যা গর্ভধারণকালীন সময়ে জমা হয়েছিল।

নিফাস অবস্থায় তা-ই বৈধ যা হায়েযের সময় বৈধ; যেমন লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যভাবে স্ত্রীকে ব্যবহার করা,

এবং হারামের ক্ষেত্রেও তাই; যেমন তার সাথে সহবাস করা, সালাত, সিয়াম, তালাক, তাওয়াফ, কুরআন তেলাওয়াত ও মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ। আর রক্ত নির্গমণ বন্ধ হওয়ার পর গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও হায়েযের মতই।

ঋতুবতী নারীর ন্যায় তার জন্য সালাত ব্যতীত সিয়াম কাজা করা ওয়াজিব।

নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন, যদি চল্লিশ দিনের পূর্বে তার রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার নিফাস শেষ হয়ে গেল, তখন সে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে এবং তার থেকে নিফাসের কারণে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো রহিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সালাত প্রসঙ্গ

প্রথমত: আযান ও ইকামতের বিধানসমূহ:

হিজরতের প্রথম বছরে আযান শরীয়তসিদ্ধ করা হয়েছে। এটা শরীয়তসম্মত হওয়ার কারণ হল, যখন তাদের পক্ষে সালাতের সময় জানা কঠিন হয়ে পড়ল, তখন তারা সালাতের ওয়াক্তের জন্য একটি নিদর্শন স্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ করলেন। আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে এই আযান দেখেছিলেন এবং ওহী তার স্বীকৃতি দিয়েছে।

আযান হল: সালাতের সময় হওয়ার ব্যাপারে অবহিতকরণ। আর ইকামত হল: সালাত শুরু হওয়ার ব্যাপারে অবহিতকরণ।

ফরজ সালাতে পুরুষদের জামাতের জন্য আযান ও ইকামাত ফরজে কিফায়া, এ দু'টি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শনের অন্তর্গত। সুতরাং তা বন্ধ করা জায়েয নয়।

আযানের শর্তসমূহ:

১- মুয়াজ্জিনকে পুরুষ হতে হবে।

২- আযান ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।

৩- আযান অবিচ্ছিন্নভাবে দিতে হবে।

৪- সালাতের সময় হওয়ার পর আযান দিতে হবে। তবে এর ব্যতিক্রম হল: ফজর ও জুমার প্রথম আযান।

আযানের সুন্নাতসমূহ:

১- তার উভয় হাতের আঙ্গুল দুই কানে রাখবে।

২- প্রথম ওয়াক্তে আযান দেয়া।

৩- হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে-বামে তাকাবে।

৪- সুন্দর কন্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া।

৫- ধীরস্থিরভাবে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করবে, তবে অধিক দীর্ঘ ও লম্বা করবে না।

৬- আযানের প্রত্যেক বাক্যের পর থামবে।

৭- আযানের সময় কেবলামূখী হবে।

আযানের সর্বমোট বাক্য পনেরটি, যেমনটি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে

সর্বদা আযান দিতেন।

আযানের শব্দসমূহ:

আল্লাহু আকবার (الله أكبر), চারবার।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (أشهد أن لا إله إلا الله), দুইবার।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (أشهد أن محمدًا رسول الله) দুইবার।,

হাইয়া আলাস সালাহ (حي على الصلاة), দুইবার।

হাইয়া আলাল ফালাহ (حي على الفلاح), দুইবার।

অতপর বলবে: আল্লাহু আকবার (الله أكبر), দুইবার।

অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله) একবার বলে শেষ করবে।

ফজরের আযানে হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর বলবে: আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাউম (الصلاة خير من النوم), দুইবার। কেননা এসময় মানুষেরা সাধারণত ঘুমিয়ে থাকে।

আর ইকামত হল এগারটি বাক্য যা দ্রুত বলবে; কেননা, এ দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে অবহিত করা হয়। সুতরাং তা দীর্ঘ করার কোন প্রয়োজন নেই।

এর বাক্যগুলো নিম্নরূপ:

আল্লাহু আকবার (الله أكبر), দুইবার।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (أشهد أن لا إله إلا الله), একবার।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (أشهد أن محمدًا رسول الله), একবার।

হাইয়া আলাস সালাহ (حي على الصلاة), একবার।

হাইয়া আলাল ফালাহ (حي على الفلاح), একবার।

কদ ক্বমাতিস সালাহ (قد قامت الصلاة), দুইবার।

আল্লাহু আকবার (الله أكبر), দুইবার।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله), একবার।

যে ব্যক্তি আযান শুনবে তার জন্য মুস্তাহাব হল মুয়াযযিন যা বলে তা-ই বলা।

তবে হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ এর ক্ষেত্রে বলবে: লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (لا حول و لا قوة إلا بالله), অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করবে। তারপর বলবে:

«اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ».

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ-দা'ওয়াতিত্-তাম্মাহ, ওয়াস্-সালাতিল-কা'ইমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল-ওয়াসীলাতা ওয়াল-ফাদীলাহ, ওয়াবআস্‌হু মাকামাম মাহমূদানিল্-লাযী ওয়া'আদতাহ, ইন্নাকা লা তুখলিফুল্-মী'আদ"। অর্থ: "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করুন এবং তাকে আপনার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"[1]

আরো বলবে"

«رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا».

উচ্চারণ: "রদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বা, ওয়াবিল্ ইসলামি দীনা, ওয়াবি-মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবিয়্যা"। অর্থ: "আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাঃ-কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।"[2]

ওযর বা পুনরায় ফিরে আসার নিয়ত ব্যতীত আযানের পর মসজিদে থেকে

1 সম্মানিত শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায রহিমাহুল্লাহ তার মাজমুউল ফাতাওয়ায় (২৯/১৪১) বলেন: 'আল্লাযি ওয়াদতা'র পরে 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়া' অংশটুকু জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে জায়্যেদ সনদে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

2 সুনানে তিরমিযী (হাদীস নং: ২৬৩৫)।

বের হওয়া হারাম।

দুই সালাতকে একত্রিক করার সময় এক আযান ও প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামাত দেয়া যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ত: সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত:

শাহাদাতাইনের পর সালাতই হল ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন, এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যেহেতু সালাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মেরাজের রাতে আসমানে ফরজ করা হয়েছে, যা আল্লাহর নিকট সালাতের মহত্ত্ব , এর আবশ্যকতার গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

সালাতের ফযীলত ও প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এর ফরয হওয়ার বিষয়টি ইসলামের অতি জরুরী একটি জ্ঞাত বিষয়।

সালাত ওয়াজিব হওয়া ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহতে অগণিত দলিল বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে:

১- আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾

“নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [আন-নিসা, আয়াত: ১০৩] অর্থাৎ এমন সময়ে সালাত আদায় করা ফরয যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন।

২- আর আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ...﴾

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে... ।” [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

৩- আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ...﴾

“অতএব তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে দ্বীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই...।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১]

৪- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

“নিশ্চয় বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া।”[1]

৫- বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

“তাদের ও আমাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সালাত। যে তা পরিত্যাগ করল, সে কুফুরী করল।”[2]

যে ব্যক্তি এর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করবে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ওলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, আর যে ব্যক্তি অলসতা ও অবজ্ঞা করে তা পরিত্যাগ করবে তার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত হল সেও কাফের, পূর্ববর্তী হাদিস ও এ বিষয়ে সাহাবাগণের ইজমার ভিত্তিতে।

1 সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮২)।

2 সুনানে তিরমিযী (হাদীস নং ২৬৫), এবং তিনি বলেছেন: “হাসান সহীহ গারীব”। শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

তৃতীয়ত: সালাতের শর্তসমূহ:

১- সালাতের ওয়াক্ত হওয়া:

কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾

..."নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" [সূরা আন-নিসা] অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা ফরয।

ফরজ সালাতসমূহের সময় নিম্নরূপ:

ক- ফজর: ফজর উদিত হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

খ- যোহর: সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়া থেকে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

গ- আসর: যোহরের সময় শেষ হওয়া থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। আর যরুরাত বা বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

ঘ- মাগরিব: সূর্যাস্ত থেকে সান্ধ্য লালিমা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

ঙ- ঈশা: মাগরিবের সময় শেষ হওয়া থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত।

২- সতর ঢাকা

তা হল, যা আবৃত রাখা ওয়াজিব এবং প্রকাশ পাওয়া নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর। পুরুষের সতর হল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর সালাতের সময় চেহারা ব্যতীত নারীর সমস্ত শরীর সতর। অন্য পুরুষ উপস্থিত থাকলে অর্থাৎ তারা মাহরাম না হলে সে তার চেহারাও ঢেকে রাখবে।

৩- নাজাসাতমুক্ত থাকা:

নাজাসাত হল নির্দিষ্ট অপবিত্রতা, যা সালাত থেকে বাধা দেয়; যেমন পেশাব, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। আর তা শরীর, স্থান বা পোশাকেও থাকতে পারে।

৪- কিবলামুখী হওয়া।

কিবলা হল, পবিত্র কাবাগৃহ। একে কিবলা বলা হয় কারণ, তার দিকে মানুষ আগমন করে।

সুতরাং কিবলামুখী হওয়া ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ...﴾

"...আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও।..." [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪]

৫- নিয়ত করা:

আভিধানিক অর্থে নিয়ত হল: ইচ্ছা করা। আর শরয়ী পরিভাষায়: আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদত পালনের দৃঢ় সংকল্প করা। তার স্থান অন্তর, সুতরাং তা মুখে উচ্চরণ করার প্রয়োজন নেই, বরং মুখে উচ্চরণ করা বিদআত।

চতুর্থত: সালাতের রুকনসমূহ:

সালাতের রুকন চৌদ্দটি:

প্রথম রুকন: সামর্থ থাকলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮] ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদিস:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

"দাঁড়িয়ে সলাত আদায় কর, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার তাহলে

কাত হয়ে।"[1]

যদি অসুস্থতাজনিত কারণে দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তবে তার অবস্থা অনুযায়ী বসে অথবা শুয়ে সালাত আদায় করবে। আর অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ হল, ভীত, উলঙ্গ, যার চিকিৎসার জন্য বসা বা শোয়া প্রয়োজন, যে কারণে সে দাঁড়াতে সক্ষম নয়। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিকে দাঁড়ানো থেকে অব্যহতি দেয়া হবে যে এমন নিয়োগকৃত ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে যে দাঁড়াতে সক্ষম নয়; সুতরাং ইমাম যদি বসে সালাত আদায় করে তবে তারাও ইমামের অনুসরণ করণার্থে বসে সালাত আদায় করবে। আর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল সালাত বসে আদায় করা জায়েয, তবে সে ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব পাবে না।

দ্বিতীয় রুকন: শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বলা।

কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَكَبِّرْ».

(তারপর তুমি কিবলামুখী হও ও তাকবীর বলো।)[2]

তার শব্দ হল, সে বলবে: আল্লাহু আকবার (الله أكبر), এটা ব্যতীত অন্য কিছু বলা যথেষ্ট হবে না।

তৃতীয় রুকন: সূরা ফাতিহা পাঠ করা:

কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

(সেই ব্যক্তির সালাত হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।)[3]

---

1 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১১১৭)।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬২৫১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৮৮৪)।

3 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৭৫৬), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৮৭২)।

চতুর্থ রুকন: প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা।

কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا...﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর ... ।" [সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৭৭]

পঞ্চম ও ষষ্ঠ রুকন:

রুকু থেকে উঠা এবং পূর্বের ন্যায় সোজা হয়ে দাঁড়ানো, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এরূপ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন:

«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».

"অতঃপর রুকু হতে উঠবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে।"[1]

সপ্তম রুকনঃ সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা।

আর তা হল, কপাল নাকসহ, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের মাথাসমূহ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ».

(সাতটি অঙ্গের উপরে সিজদা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে: কপাল, এ সময় তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের মাথাসমূহ।)[2]

---

1 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৭৯৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৩৯৮)।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৮১২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৪৯০)।

অষ্টম রুকন: সিজদা হতে উঠা এবং উভয় সিজদার মাঝে বসা:

দলিল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদিস:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا».

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না বসে (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন না।)[1]

নবম রুকন: প্রতিটি রুকন প্রশান্ত চিত্তে আদায় করা।

তা হল ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা যদিও কম হয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন:

«حَتَّى تَطْمَئِنَّ».

(যতক্ষণ না স্থির হবে)[2]

দশম ও এগারতম রুকন:

শেষ তাশাহহুদ পাঠ করা ও তার জন্য বসা। দলীল, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীস:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে তখন সে যেন বলে:

উচ্চারণ:

---

1 সহীহ মুসলিম: (৪৯৮)

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৭২৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৩৯৮)।

“আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু, আস্সালামু ‘আলাইকা আইয়ুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্সালামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।” অর্থ: (সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ‘ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।)[1]

দ্বাদশ রুকন: শেষ বৈঠকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করা।

সে বলবে:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ».

(হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের উপর সালাত নাযিল করুন।)[2] এর চেয়ে দরুদের বাকী অংশ বলা সুন্নাত।

ত্রয়োদশ রুকন: রুকনসমূহের মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ধারাবাহিকভাবে আদায় করতেন। আর তিনি বলেছেন:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

(তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত

1 সহীহ বুখারী (৭৯৭), মুসলিম (৪০২)।

2 সুনানে তিরমিযী (হাদীস নং: ৮৩৯)।

আদায় কর।)[1] সালাতে ত্রুটিকারীকে তিনি «ثُمَّ» তথা ‘অতঃপর’ শব্দের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

চতুর্দশ রুকন: সালাম ফিরানো।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَخِتَامُهَا التَّسْلِيمُ».

(আর সালাতের সমাপ্তি হলো তাসলীম তথা সালাম ফিরানো।) এবং তার বাণী:

«وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

(আর সালাত থেকে মুক্ত হওয়া হলো তাসলীম তথা সালাম ফিরানো।)[2]

পঞ্চমত: সালাতের ওয়াজিবসমূহ:

সালাতের ওয়াজিব আটটি:

১- তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সকল তাকবীর।

২- রুকুতে একবার “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” (سبحان ربي العظيم) বলা। তিনবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সুন্নাত, যা পূর্ণতার সর্বনিম্ন স্তর। আর দশবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা তার সর্বোচ্চ স্তর।

৩- রুকু থেকে উঠার সময় ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه) (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলা।

৪- রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় (ربنا ولك الحمد) (রব্বানা-ওয়ালাকাল হামদ) বলা।

৫- সিজদাতে একবার (سبحان ربي الأعلى) (সুবহানা রব্বিয়াল আলা)

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬০০৮)।

[2] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১১১০)।

বলা। তিনবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সুন্নাত।

৬- দুই সিজদার মাঝখানে একবার (رَبِّ اغْفِرْ لِي) (রব্বিগফিরলী) বলা। তিনবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সুন্নাত।

৭- প্রথম তাশাহুদ। আর তা হল, সে এ দোয়া বলবে:

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

উচ্চারণ: "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু, আস্সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" অর্থ: "সব ধরনের বড়ত্ব সম্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি-নিরাপত্তা, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম শান্তি-নিরাপত্তা আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[1]

৮- প্রথম তাশাহুদের জন্য বসা।

ষষ্ঠত: সালাতের সুন্নাতসমূহ:

সালাতের সুন্নাত হল, যে সমস্ত কাজ ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয় না। তা দু'প্রকার: কথা সংক্রান্ত সুন্নাহ এবং কাজ সংক্রান্ত সুন্নাহ।

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৮৩৫)।

প্রথমত: কথা সংক্রান্ত সুন্নাহ:

১- সালাত শুরু করার দোয়া (সানা) পাঠ করা। এর একাধিক বাক্য রয়েছে, তন্মধ্যে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ».

উচ্চারণ: "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।"

(হে আল্লাহ! প্রশংসা ও পবিত্রতা আপনারই, আপনার নাম বরকতময়, আপনি সম্মানিত, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।)[1]

২- সূরা ফাতিহার পূর্বে আউযুবিল্লাহ বলা। অর্থাৎ সে বলবে:

«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।)

৩- কিরাতের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া। অর্থাৎ সে বলবে:

«بسم الله الرحمن الرحيم» (পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি)

৪- রুকু এবং সিজদার তাসবীহ একবারের অতিরিক্ত যা পড়া হয়।

৫- নিম্নের বাক্য একবারের অতিরিক্ত যা পড়া হয়:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي».

উচ্চারণ: "রাব্বিগফির লী", অর্থ: “হে আমার রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” দুই সাজদার মাঝে।

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৮৪৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৩৯৯)।

৬- এই দোয়া বলা:

«مَلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمَلْءَ الْأَرْضِ، وَمَلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمَلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

উচ্চারণ: "মাল’আস্-সামাওয়াতি, ওয়া মাল’আল আরদি, ওয়া মাল’আ মা বাইনাহুমা, ওয়া মাল’আ মা শি’তা মিন শাইয়িন বা’দু।" অর্থ: "(আপনার প্রশংসা) আসমানসমূহ পূর্ণ, যমীনসমূহ পূর্ণ, এর পরেও আপনি যে সমস্ত বস্তু পরিমাণ চান, সেসবও পূর্ণ।" ,

«رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ».

‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ «رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ» বলার পর।[1]

৭- সূরা ফাতিহার পরে অন্য কিরাত পাঠ করা।

৮- এ দোয়া বলা:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল্ মাহইয়া ওয়ালমামাতি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।

"আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।"[2]

---

1 সুনানে তিরমিযী (হাদীস নং: ২৬৬)।

2 সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৮৮)।

শেষ বৈঠকে এর বাইরে আরো অন্যান্য দোয়া বলা।

দ্বিতীয়ত: কাজ সংক্রান্ত সুন্নাহ:

১- চারস্থানে দুই হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর উত্তোলন করা:

ক- তাকবীরে তাহরীমার সময়।

খ- রুকুর সময়।

গ- রুকু থেকে উঠার সময়।

ঘ- তৃতীয় রাকাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর সময়।

২- রুকুর পূর্বে ও পরে দাঁড়ানো অবস্থায় বুকের উপর ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখা।

৩- সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা।

৪- সিজদার সময় দুই পার্শ্বদেশ থেকে দুই বাহুকে দূরে রাখা।

সিজদাকালীন পেটকে উভয় রান থেকে দূরে রাখা।

তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের শেষ বৈঠক ব্যতীত সালাতের সকল বৈঠকে ইফতিরাশ পদ্ধতিতে তথা ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা।

৭- তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসা।

সপ্তমত: সালাতের বিবরণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন কিবলামুখী হতেন, উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং আঙ্গুলের তালুর দিক কিবলামুখী করে বলতেন:

«الله أكبر».

আল্লাহু আকবার

২- অতঃপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন এবং বুকের উপর দুই

হাত রাখতেন।

২- তারপর ইস্তিফতাহ (সূচনার) দোয়া পড়তেন, তবে সর্বদাই একটি নির্দষ্ট দোয়া পড়তেন না। সুতরাং তার থেকে প্রমাণিত ইস্তেফতাহর সকল দোয়ার যে কোনটি পড়া জায়েয, তন্মধ্যে একটি হল:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

উচ্চারণ: "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।"

(হে আল্লাহ! প্রশংসা ও পবিত্রতা আপনারই, আপনার নাম বরকতময়, আপনি সম্মানিত, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।)

৪- অতঃপর বলবে:

«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

উচ্চারণ: "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।"

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

৫- তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, শেষে বলবে: «آمين» আমিন।

৬- এরপর কুরআন থেকে যতটুকু তিলাওয়াত করা সহজ তা তিলাওয়াত করবে। ফজর, মাগরিব ও ঈশার সালাতের প্রথম দুই রাকাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে, অন্যান্য সালাতে আস্তে পড়বে। সকল সালাতে প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে লম্বা করবে,

৭- অতঃপর শুরুর ন্যায় উভয় হাতকে উত্তোলন করবে, এবং আল্লাহু

আকবার (الله أكبر) বলবে, এবং রুকু করার জন্য ঝুঁকবে, এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রেখে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখবে ও শক্ত করে ধরবে, তার পিঠকে সোজা করে, মাথাকে পিঠের বরাবর রাখবে; উঁচু-নিচু করবে না। আর বলবে:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ».

“সুবহানা রব্বিয়াল আযীম”, একবার। এর পূর্ণতার নুন্যতম সংখ্যা হল তিনবার বলা যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

৮- অতঃপর এই বলে মাথা উত্তোলন করবে:

«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

"সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ।" অর্থ: আল্লাহ তার কথা শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে। আর রুকুর ন্যায় উভয় হাতকে উত্তোলন করবে।

৯- যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন বলবে:

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مَلْءَ السَّمَاءِ، وَمَلْءَ الْأَرْضِ، وَمَلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمَلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি, মাল'আস সামা-য়ি, ওয়া মাল'আল আরদ্বি, ওয়া মাল'আ মা বাইনাহুমা, ওয়া মাল'আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু, আহলাস সানা-ই ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা কলাল আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন, লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা, ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।"

অর্থ: (হে আমাদের রব! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আপনার প্রশংসা অসংখ্য, উত্তম ও বরকতময়। আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং এরপরে আপনি যা চান সব কিছুই আপনার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আপনি প্রশংসা ও মর্যাদার পূর্ণ হকদ্বার। বান্দা যা বলে, তার থেকেও বেশী। আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। আপনি যা দান করেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই, আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা দেওয়ার মত কেউ নেই। আপনি ব্যতীত কোনো বিত্ত ও সম্মান বিত্তশালীকে উপকার করতে পারে না।)[1] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘসময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

১০- তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে, এ সময় হাত উত্তোলন করবে না, স্বীয় কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে সিজদা করবে, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করবে, ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে, কপাল ও নাককে যমীনে ভালভাবে রাখবে, উভয় কব্জির উপর ভর দিবে ও কনুইকে উঠিয়ে রাখবে, দুই বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখবে, স্বীয় পেটকে উরু থেকে উপরে রাখবে, এবং উরুকে পায়ের নলা থেকে উপরে রাখবে, আর সিজদায় বলবে:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى».

(সুবহানা রব্বিয়াল আলা), (আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি সুউচ্চ) একবার, পূর্ণতার নুন্যতম সংখ্যা হল তিনবার বলা যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়বে।

১১- তারপর «الله أكبر» "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উত্তোলন করবে, অতঃপর বাম পা বিছিয়ে দিবে ও তার উপর বসবে, আর ডান পা খাড়া রাখবে,

---

1 সুনানে আবু দাউদ (হাদীস নং ৫১৬৮)।

উরুর উপর উভয় হাতকে রাখবে অতঃপর বলবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي».

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুর্নী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী।"

(হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন, আমাকে হেদায়াত করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।)[1]

১২- তারপর আবার তাকবীর দিবে ও সিজদা করবে, দ্বিতীয় সিজদায় প্রথম সিজদার অনুরূপ কাজ করবে।

১৩- তারপর «الله أكبر» "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উত্তোলন করবে এবং হাঁটু ও উরুর উপর ভর দিয়ে পায়ের পাতার উপর দাঁড়াবে।

১৪- যখন পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন কিরাত পড়া শুরু করবে, প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে,

১৫- তারপর প্রথম বৈঠকে ইফতিরাশ পদ্ধতিতে বসবে, যেমনভাবে দুই সিজদার মাঝে বসে, ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখবে, এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলকে মধ্যমার উপর রেখে গোলাকৃতির ন্যায় বানাবে, আর তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে ও তার দিকে তাকাবে। আর বলবে:

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

উচ্চারণ: "আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু,

[1] সুনানে তিরমিযী (হাদীস নং: ২৮৪)।

আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান-নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহিন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

অর্থ: (সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৈঠক সংক্ষিপ্ত করতেন।

১৬- তারপর তাকবীর দিয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত সালাত পড়বে এবং এই দুই রাকাতকে প্রথম দুই রাকাতের চেয়ে সংক্ষেপ করবে, এই দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

১৭- অতঃপর শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসবে, তাওয়াররুক হল: বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তাকে ডান দিকে বের করে দিবে এবং ডান পাকে খাড়া করে রাখবে এবং নিতম্ব যমীনে রাখবে।

১৮- অতঃপর শেষ তাশাহহুদ পাঠ করবে, আর তা প্রথম তাশাহহুদের ন্যায়, এর সাথে আরো অতিরিক্ত বলবে:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন,

কামা সল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।"

অর্থ: (হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীমের বংশের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদাশীল। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীমের বংশের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদাশীল।)

১৯- আর আল্লাহর নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দোয়াগুলো পাঠ করবে।

২০- এরপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে এবং বলবে:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ».

উচ্চারণ: "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"

(আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।) বাম দিকেও অনুরূপ করবে; সালাম শুরু করবে কিবলামুখী হয়ে আর শেষ করবে সালাম ফিরানোর দিকে পূর্ণ তাকানোর মাধ্যমে।

অষ্টমত: সালাতের মাকরূহ বিষয়সমূহ:

১- বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করা।

২- আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

৩- বিনা প্রয়োজনে চোখ বন্ধ রাখা।

৪- সিজদার সময় উভয় বাহুকে বিছিয়ে দেয়া।

৫- বিনা প্রয়োজনে নাক-মুখ ঢেকে রাখা।

৬- পেশাব-পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায় অথবা ক্ষুধার্ত হয়েও খাবারের উপস্থিতিতে সালাত আদায় করা।

৭- কপাল ও নাকে লেগে থাকা সিজদার ছাপ মুছে ফেলা, তবে সালাত শেষ হওয়ার পর তা মুছে ফেলাতে কোন সমস্যা নেই।

৮- বিনা প্রয়োজনে সালাতে কিয়ামরত অবস্থায় দেয়াল বা অনুরূপ কিছুতে হেলান দেয়া।

নবমত: সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

১- পানাহার করা।

২- সালাতে বাইরের কথা বলা।

৩- উচ্চ স্বরে হাসা।

৪- ইচ্ছাকৃত সালাতের কোন রুকন বা ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া।

৫- ইচ্ছাকৃত রুকন বা রাকাত বৃদ্ধি করা।

৬- ইচ্ছাকৃত ইমামের পূর্বে সালাম ফিরানো।

৭- বিনা প্রয়োজনে সালাত বহির্ভূত ধারাবাহিকভাবে প্রচুর নড়াচড়া করা।

৮- সালাতের শর্তসমূহের বিপরীত কিছু ঘটা; যেমন অযু ভঙ্গ হওয়া, স্বেচ্ছায় লজ্জাস্থান উম্মুক্ত করা, বিনা প্রয়োজনে শরীরকে কিবলা থেকে অধিক পরিমাণে ঘুরিয়ে দেয়া ও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলা।

দশমত: সাহু সিজদা:

সাহু অর্থ: ভুলে যাওয়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুল করেছেন। কারণ ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, তার বিস্মৃতি উম্মতের জন্য আল্লাহর নিয়ামতস্বরূপ এবং দ্বীনের পূর্ণতার অংশ; যাতে তারা তাকে অনুকরণ করতে পারে যা তিনি তাদের জন্য ভুলের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন।

যেসমস্ত কারণে সাহু সিজদার বিধান প্রযোজ্য:

১- প্রথম অবস্থা:

সালাতে বেশি করা; তা কার্য সংক্রান্ত হোক বা কথা সংক্রান্ত হোক:

ক- কার্য সংক্রান্ত বৃদ্ধি: যদি এই বৃদ্ধি সালাতের কোন অংশ হয়; যেমন বসার স্থানে দাঁড়ানো বা দাঁড়ানো স্থানে বসা কিংবা রুকু বা সিজদা বৃদ্ধি করা, যদি ভুলক্রমে এরূপ করে ফেলে তবে সাহু সিজদা করবে।

খ- কথা সংক্রান্ত বৃদ্ধি: যেমন রুকু বা সিজদায় কিরাত পড়া,

এরূপ করলে তার জন্য সাহু সিজদা করা মুস্তাহাব।

২- দ্বিতীয় অবস্থা:

ভুলক্রমে সালাতে কম করা, আর এটি নিম্নের দু'টির যে কোন একভাবে হতে পারে:

ক- সালাতের কোন রুকন ছেড়ে দেয়া: যদি তা তাকবীরে তাহরীমা হয় তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে সাহু সিজদা কোন কাজে লাগবে না। আর যদি তা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন রুকন হয়, যেমন রুকু বা সিজদা এবং পরবর্তী রাকাতের কিরাত শুরুর পূর্বে স্মরণ হয়, তবে তার জন্য যে রুকন ছুটে গেছে সেখানে ফিরে আসা ওয়াজিব, সে ঐ রুকনসহ সালাতের পরবর্তী অংশগুলো আদায় করবে।

আর যদি পরবর্তী রাকাতে কিরাত শুরুর পর স্মরণ হয়, তবে তার ঐ রাকাত বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী রাকাত তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

খ- সালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া: যেমন প্রথম তাশাহহুদ বা রুকুতে তাসবীহ পড়া ভুলে যাওয়া। এ অবস্থায় সাহু সিজদা করবে।

৩- তৃতীয় অবস্থা: সন্দেহ:

যেমন যদি যোহরের সালাতে তার সন্দেহ হয় যে, সে তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে, তবে এই অবস্থায়:

ক- যদি তার নিকট কোন একটি সংখ্যা প্রাধান্য পায়; তাহলে তার উপর

আমল করবে ও সাহু সিজদা করবে।

খ- আর যদি কোন একটি সংখ্যা প্রাধান্য না পায়; তবে যে সংখ্যাটি সুনিশ্চিত তার উপর নির্ভর করবে ও সাহু সিজদা করবে।

আর যদি সালাত শেষ করার পর সন্দেহ হয় কিংবা সে অধিক সন্দেহপ্রবণ হয়; তবে এর প্রতি গুরুত্ব দিবে না।

ফায়েদা: সাহু সিজদা সালামের পূর্বে দিতে হবে: যদি কমতির কারণে কিংবা এমন সন্দেহের কারণে হয় সেখানে তার নিকট কোন একটি দিক প্রাধান্য পায়নি। সালামের পরে দিতে হবে: যদি বৃদ্ধির কারণে কিংবা এমন সন্দেহের কারণে হয় সেখানে তার নিকট কোন একটি দিক প্রাধান্য পেয়ে সে অনুযায়ী কাজ করেছে। আর এ বিষয়টি প্রশস্ত ইনশা আল্লাহ।

একাদশতম: সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ

মূল হল, সকল সময়ে সালাত আদায় করা জায়েয, কিন্তু শরীয়তে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

১- ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খালি চোখে এর উচ্চতা এক বর্শা সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

২- যখন সূর্য মধ্য আকাশে থাকে যতক্ষণ না তা পশ্চিম আকাশে ঢলে যায়, এটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নিষিদ্ধ সময়।

৩- আসরের সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এটি সবচেয়ে দীর্ঘ নিষিদ্ধ সময়।

নিষিদ্ধ সময়ে যে সমস্ত সালাত আদায় করা জায়েয:

১- ছুটে যাওয়া ফরজ সালাতের কাযা আদায় করা।

২- কারণবিশিষ্ট সালাতগুলো, যেমন: মসজিদে প্রবেশের সালাত, তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত সালাত, সূর্যগ্রহণের সালাত ও জানাযার সালাত।

৩- ফজর সালাতের পর ফজরের সুন্নাত কাযা করা।

দ্বাদশতম: জামাতে সালাত:

মসজিদে জামাতে সালাত আদায় করা ইসলামের অন্যতম নির্দশন, মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, বরং তা ইসলামের অন্যতম নির্দশন।

১- জামাতে সালাত আদায় করার হুকম:

সক্ষম পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব, মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায়, নিরাপত্তা ও ভয় উভয় অবস্থায়-ই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

জামাতে সালাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত: কুরআন ও সুন্নাহ এবং মুসলমানদের শতাব্দীর পর শতাব্দীর পূর্বাপর সকলের আমল থেকে।

কুরআন হতে: মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ...﴾

"আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন, তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায়।"... [আন-নিসা, আয়াত: ১০২] অত্র আয়াতটি জামাতে সালাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালীভাবে প্রমাণ করে। কেননা ভয়ের অবস্থতেও মুসলিমদেরকে জামাত পরিত্যাগ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি। সুতরাং জামাত যদি ওয়াজিব না হত, তাহলে ভয়ের ওযরটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ওযর হিসেবে পরিগণিত হত। জামাতে সালাত পরিত্যাগ করা ও তা কঠিন মনে করা মুনাফিকদের সর্বাধিক প্রশিদ্ধ বৈশিষ্ট্য।

সুন্নাহ হতে দলীল: এ সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে:

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে:

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ،

فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ».

"জনৈক অন্ধ ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার কোন পথপ্রদর্শক নেই। অতঃপর লোকটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন যেন তিনি তাকে বাড়িতে সালাত আদায়ের অনুমতি দেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাকে বললেন: "তবে তুমি আহবানে সাড়া দাও।"[1]

সে ব্যক্তি অন্ধ ও তার জন্য কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে সালাতের জামাতে উপস্থিত হতে ও আহবানে সাড়া দিতে আদেশ দিলেন, যা জামাতে সালাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২- যতটুকু অংশের মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে:

ইমামের সাথে এক রাকাত সালাত পাওয়ার মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

(যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকাত পেল, সে ঐ সালাত পেল।)[2]

৩- যতটুকু অংশের মাধ্যমে রাকাত পাওয়া যাবে:

রুকু পাওয়ার মাধ্যমে ঐ রাকাত পাওয়া যাবে, সুতরাং কোন মাসবূক ব্যক্তি যদি তার ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, তার জন্য ওয়াজিব হল সে দণ্ডায়মান

---

1 সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১৪৮৪)।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬০৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৬০২)।

অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তারপর আবার তাকবীর বলে রুকুতে যাবে, যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমার উপর ক্ষান্ত হয় , তবে তা রুকুর তাকবীরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

৪- যে সমস্ত ওযর একজন ব্যক্তিকে জামাতে সালাত পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয়:

১- এমন অসুস্থতা যার কারণে জামাত ও জুমুআয় উপস্থিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়।

২- পেশাব বা পায়খানার এমন চাপ; যার কারণে সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয় এবং শরীরের ক্ষতি হয়।

৩- ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় বা তার মন খাবারের প্রতি আগ্রহী থাকা অবস্থায় খাবারের উপস্থিতি। তবে শর্ত হল, সে যেন এটাকে জামাতে সালাত ত্যাগ করার অভ্যাস বা কৌশল হিসেবে গ্রহণ না করে।

৪- নিজের আত্মা, সম্পদ ইত্যাদির নিশ্চিত ক্ষতির আশংকা।

ত্রয়োদশতম: সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত:

সকল বৈধ যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত আদায় করা শরীয়তসিদ্ধ, যেমন, কাফের, সীমালংকারী ও যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ...﴾

“... যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্‌না সৃষ্টি করবে ... ।” [সূরা আন-নিসা: ১০১] এর উপরই অন্যান্য যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয তা কিয়াস করুন।

দু’টি শর্তে সালাতুল খাওফের শরীয়তসম্মত:

১) এমন শত্রু হতে হবে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয।

২) সালাতের সময় মুসলিমদের উপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকা।

সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি:

এর একাধিক পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হল যেমনটি সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِي ﷺ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

(একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি থাকলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সঙ্গে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাকাত সালাত আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুক্তাদীগণ তাদের সালাত পূর্ণ করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করে স্থির হয়ে বসে থাকলেন। এরপর মুক্তাদীগণ তাদের নিজেদের সালাত সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।)[1]

আমরা সালাতুল খাওফ থেকে নিচের ফায়দাগুলো পাই:

১- ইসলামে সালাত ও জামাতে সালাতের গুরুত্ব; কেননা এমন ভয়ংকর যুদ্ধাবস্থাতেও তা রহিত হয়নি।

২- এই উম্মতের উপর থেকে কষ্ট দূর করা এবং শরীয়তের মহানুভবতা ও সকল স্থান-সময়ে তার উপযোগিতা।

৩- ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গতা এবং এই শরীয়তে সকল অবস্থার জন্য

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৪১৩০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৮৪২)।

সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধানের প্রবর্তন।

চতুর্দশতম: জুমার সালাত:

প্রথমত: এর হুকুম:

জুমার সালাত আদায় করা: ওযরবিহীন, মুকীম, জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলিম পুরুষের ওপর ফরজে আইন।

কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩﴾

“হে ঈমানদারগণ ! জুমু’আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।” [সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত: ০৯]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

(লোকেরা যেন জুমা ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন, অতঃপর তারা অবশ্যই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।)[1]

দ্বিতীয়ত: জুমার সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ:

১) সময় হওয়া: জুমার ওয়াক্ত যোহর সালাতের ওয়াক্তের ন্যায়, সুতরাং জুমার ওয়াক্ত হওয়ার আগে বা ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পরে আদায় করলে তা

---

[1] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৮৬৫)।

শুদ্ধ হবে না।

২) জুমায় একটি দল উপস্থিত হতে হবে, আর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী দলের সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে তিনজন। সুতরাং শুধুমাত্র একজন বা দুইজন দ্বারা জুমা বিশুদ্ধ হবে না।

৩) মুসল্লীদেরকে এমন ঘর-বাড়ীতে বসবাস করতে হবে, যা নির্মাণের প্রথা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, চাই তা সিমেন্ট, পাথর বা কাদামাটি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হোক, কাজেই তা মরুভূমির লোকদের জন্য বিশুদ্ধ নয়, যারা তাঁবু ও পশমের তৈরী গৃহের মালিক, যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করে না, বরং তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের গবাদি পশুর জন্য ঘাসের অনুসন্ধান করে।

জুমআর সালাতের পূর্বে দুটি খুতবা প্রদান করবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এরূপ করতেন।

তৃতীয়ত: জুমার দুই খুতবার রুকনসমূহ:

১- আল্লাহর প্রশংসা করা ও দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করা।

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়া।

৩- আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের অসিয়ত করা।

৪- কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা।

৫- উপদেশ প্রদান করা।

চতুর্থত: জুমার দুই খুতবার মুস্তাহাবসমূহ:

১- মিম্বারের উপর খুতবা প্রদান করা।

২- সংক্ষিপ্ত বৈঠকের মাধ্যমে দুই খুতবার মাঝে পার্থক্য করা। ৩- উভয় খুতবায় মুসলিমদের জন্য ও মুসলিম শাসকদের জন্য দোয়া করা।

৪- উভয় খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করা।

৫- মিম্বারে উঠার সময় খতীব কর্তৃক মানুষকে সালাম দেয়া।

পঞ্চমত: জুমুআর দিনের মুস্তাহাবসমূহ:

১- মিসওয়াক করা।

২- সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করা।

৩- জুমুআর সালাতের জন্য সকাল সকাল বের হওয়া।

৪- হেঁটে মসজিদে যাওয়া, আরোহন করে নয়।

৪- ইমামের নিকটবর্তী হওয়া।

৬- দোয়া করা

৭- সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।

৮- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সালাত পাঠ করা।

ষষ্ঠত: জুমার সালাতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য যা কিছু নিষিদ্ধ:

১- জুমার দিনে ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় কথা বলা হারাম, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

(জুমার দিন ইমামের খুতবা প্রদানকালে যখন তুমি তোমার সাথীকে বললে, 'চুপ কর'- তখন তুমিও অনর্থক কাজ করলে।)[1] অর্থাৎ তুমি অনর্থক বিষয় বললে, (اللغو) বলতে পাপের কথা ও কাজকে বুঝায়।

২) মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়া মাকরূহ, তবে তিনি যদি ইমাম হন কিংবা এমন ফাঁকা স্থানে যেতে চান যেখানে ঘাড় ডিঙ্গানো ছাড়া পৌছানো সম্ভব নয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

জুমা পাওয়া:

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার সালাতের দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পেল; সে

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৯৩৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৮৫১)।

জুমা পেয়ে গেল এবং সে জুমার সালাত হিসেবে দুই রাকাত পূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি জুমার সালাতের দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পাবে না; তার জুমা ছুটে যাবে এবং সে যোহর হিসেবে চার রাকাত পূর্ণ করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির ঘুম বা অন্য কোন কারণে জুমা ছুটে যায়, সে যোহরের নামাজ আদায় করে নিবে।

পঞ্চদশতম: ওযরগ্রস্ত লোকদের সালাত:

প্রথমত: অসুস্থ ব্যক্তির সালাত:

প্রথম: অসুস্থ ব্যক্তির উপর তার সাধ্যানুযায়ী সালাত আদায় করা ওয়াজিব, যতক্ষণ তার জ্ঞান থাকে ততক্ষণ সালাত নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয়: অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সালাত আদায় করবে?

১- অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায় ওয়াজিব, যদি সে কোন কষ্ট বা ক্ষতি ছাড়াই দাঁড়াতে পারে এবং সে রুকু ও সিজদা করবে।

২- দাঁড়ানোর সক্ষমতা সত্ত্বেও যদি রুকু বা সিজদা করতে কষ্ট হয়; তবে ইশারায় রুকু করবে এবং বসে সিজদা করবে।

৩-যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম হয়; তবে বসে আদায় করবে। তার জন্য সুন্নত হলো দাঁড়ানোর স্থানে চার জানু হয়ে সালাত আদায় করবে, রুকু করার জন্য ইশারা করবে এবং সম্ভব হলে মাটিতে সিজদা করবে, যদি সম্ভব না হয় তবে ইশারায় সিজদা করবে এবং তা রুকু থেকে বেশি নিচু হবে।

৪- যদি বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হয়; তবে কিবলামুখী অবস্থায় কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে, সম্ভব হলে ডান পার্শ্বে শুয়ে সালাত আদায় করা উত্তম এবং ইশারায় রুকু ও সিজদা করবে।

৫- যদি কাত হয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হয়; তবে চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে, আর তার উভয় পা থাকবে কিবলার দিকে এবং ইশারায়

রুকু ও সিজদা করবে।

৬- যদি ইশারায় রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম না হয়; তবে মাথা দ্বারা ইশারা করবে। যদি এটিও তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়; তবে তার থেকে ইশারা করার বিধান রহিত হয়ে যাবে এবং সে অন্তরে সালাতের কাজগুলো আদায় করবে। ফলে সে ঐ অবস্থাতে থেকেই রুকু, সিজদা ও বৈঠকের নিয়ত করবে এবং নির্দিষ্ট দোয়াগুলো পাঠ করবে।

৭- অসুস্থ ব্যক্তি তার সক্ষমতা অনুযায়ী সালাতের শর্তগুলো পালন করবে, যেমন: কিবলামুখী হওয়া, পানি দিয়ে অযু করা, অক্ষম হলে তায়াম্মুম করা, নাজাসাত হতে পবিত্র হওয়া, এগুলোর যে কোনটি করতে অক্ষম হলে; তার থেকে সে বিধান রহিত হয়ে যাবে, আর সে তার অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করবে, সালাতকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করবে না।

৮- সুন্নাত হল, কিয়াম ও রুকুর সময় অসুস্থ ব্যক্তি চারজানু হয়ে বসবে, আর অন্য ক্ষেত্রে পা বিছিয়ে বসবে।

দ্বিতীয়ত: মুসাফির ব্যক্তির সালাত:

১- ওযরগ্রস্থ ব্যক্তিদের একজন হলেন মুসাফির, তার জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট সালাত কসর করে দুই রাকাত পড়া শরীয়তসম্মত। কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ...﴾

"আর যখন তোমরা যমীনে সফর করবে, তখন তোমাদের সালাত কসর করাতে কোন দোষ নেই ... ।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০১]

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ،

حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ».

(আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মদিনা থেকে মক্কায় গমন করি। আমরা মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকাত, দু'রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন।)[1]

সফরে সালাত কসর শুরু হবে তার নিজ শহরের ঘরবাড়ি থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে; কেননা আল্লাহ তায়ালা কসর বৈধ করেছেন মুসাফিরের জন্য, আর তার শহর থেকে বের হওয়ার পূর্বে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে না। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের যাত্রা করলে কসর করতেন।

২- যে দূরুত্ব অতিক্রম করার ইচ্ছা করলে একজন মুসাফিরের জন্য কসর করা বৈধ হবে তা হল প্রায় আশি কিঃমিঃ।

৩- নিজ শহরে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত মুসাফিরের জন্য ফিরার পথে কসর করা জায়েয।

৪- যখন কোন মুসাফির কোন শহরে পৌছে সেখানে অবস্থানের নিয়ত করে; তখন তার তিন অবস্থা:

ক) সে চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত করবে; তাহলে তাকে বসবাসের প্রথম দিন থেকেই পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে, তাকে সফরের ছাড়ের সুবিধা দেয়া হবে না।

খ) সে চার দিন বা তার কম থাকার নিয়ত করবে; তাহলে কসর করা ও সফরের ছাড় গ্রহণ করা জায়েয।

গ) সে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন অবস্থানের নিয়ত করেনি, বরং উক্ত স্থানে প্রয়োজন অনুসারে এক দিন বা দশ দিন অবস্থান করবে, অথবা তার চিকিৎসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে, যখনই তার উদ্দেশ্য সাধন হবে, তখন বাড়ী ফিরে

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১০৮১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৬৯৩)।

যাবে; এ ধরণের ব্যক্তির জন্য বাড়ী ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত কসর করা ও সফরের সুবিধা গ্রহণ করা জায়েয়, যদিও তার অবস্থান চার দিনের বেশী হয়।

৫- যদি মুসাফির ব্যক্তি মুকিম ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে; তাহলে তার জন্য পূর্ণ সালাত আদায় করা ওয়াজিব, যদিও ইমামের সাথে শুধুমাত্র শেষ বৈঠকে শরীক হয় না কেন।

৬- যদি মুকিম ব্যক্তি মুসাফির ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে যিনি সালাত কসর করবেন; তাহলে মুকিমের জন্য ইমামের সালামের পর সালাত পূর্ণ করা ওয়াজিব।

ষষ্ঠদশতম: দুই ঈদের সালাত

মুসলিমদের ঈদগুলো আল্লাহ প্রদত্ত , যা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তারা তা নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করেননি। মুসলিমদের শুধুমাত্র দু'টি ঈদ রয়েছে, তা হল: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। পক্ষান্তরে কাফেরদের ঈদসমূহ ও বিদআতী ঈদসমূহ যা আল্লাহ তায়ালা প্রণয়ন করেননি এবং তার আদেশও দেননি, বরং তারা নিজেরা তা প্রণয়ন করেছে।

দুই ঈদের সালাতের হুকুম:

এটি ফরযে কিফায়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন তা নিয়মিত পালন করেছেন, এটি দ্বীনের প্রতীক ও প্রকাশ্য নিদর্শন।

ঈদের সালাতের সময়: ঈদের সালাতের সময় শুরু হয় সূর্য বর্শা সমপরিমাণ উপরে উঠার পর হতে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের প্রায় পনের মিনিট পর হতে এবং সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর এর সময় শেষ হয়।

দুই ঈদের সালাতের পদ্ধতি:

১- প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তারপর সানা পাঠ করবে, তারপর ছয়টি তাকবীর দিবে, প্রতিটি তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করবে এবং

তাকবীর বলার মাঝে আল্লাহর গুণকীর্তন ও তাঁর প্রশংসা করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে। এরপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ করে কিরাত পড়া শুরু করবে।

২- দ্বিতীয় রাকাতে স্থানান্তরিত হওয়ার তাকবীর বলার পর, পাঁচটি তাকবীর দিবে, এরপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ করে কিরাত পড়া শুরু করবে। প্রথম রাকাতে সূরা আল-আলা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-গাশিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব।

৩- সালাম ফিরানোর পর; ইমাম মিম্বারে উঠবেন, অতঃপর দু'টি খুতবা দিবেন এবং দুই খুতবার মাঝে সংক্ষিপ্তভাবে বসবেন, যেমনটি জুমার খুতবায় করা হয়।

ঈদের সুন্নাতসমূহ:

ক- গোসল করা।

খ- পরিচ্ছন্ন হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার।

গ- ঈদুল ফিতরে বের হওয়ার আগে খাওয়া এবং ঈদুল আযহার পরে কুরবানী থাকলে তা থেকে খাওয়া।

ঘ- পায়ে হেঁটে ঈদগাহে বের হওয়া।

ঙ- এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা।

চ- মুক্তাদিদের জন্য সকাল সকাল ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া।

তাকবীর পাঠ:

ঈদের দুই রাত, যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন, ও তাশরীকের দিনগুলোতে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। আর তা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: তাকবীরে মুতলাক: এর জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই।

১- ঈদুল ফিতরে: ঈদের রাতের সূর্যাস্ত হতে ঈদের সালাত শুরু হওয়া পর্যন্ত।

২- ঈদুল আযহায়: যিলহজ মাসের প্রথম তারিখ সূর্যাস্ত হতে তাশরীরের শেষ দিন পর্যন্ত।

দ্বিতীয় প্রকার: তাকবীরে মুকায়্যাদ: এ তাকবীর ফরজ সালাতের পর পাঠ করার সাথে শর্তযুক্ত।

১- মুহরিম ব্যতীত অন্যদের জন্য: আরাফার দিন ফজর থেকে তাশরীকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত।

২- মুহরিমের জন্য: ঈদের দিন যোহর সালাত হতে তাশরীকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত।

সপ্তদশতম: সালাতুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের নামাজ):

কুসুফ ও খুসুফের অর্থ:

খুসুফ হল: রাতে চাঁদের আলোর সম্পূর্ণ বা আংশিক হারিয়ে যাওয়া। তথা চন্দ্রগ্রহণ।

আর কুসুফ হল: দিনের বেলায় সূর্যের আলোর সম্পূর্ণ বা আংশিক হারিয়ে যাওয়া তথা সূর্যগ্রহণ।

সালাতুল কুসুফের হুকুম:

তা আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল প্রমাণ করে, যেহেতু তিনি তার যুগে সূর্যগ্রহণের সময় এ সালাত আদায় করতেন। অনুরূপভাবে এই সালাত আদায়ে তার আদেশও এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে এবং মুসলিমগণ এটি শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

এই সালাতের ওয়াক্ত:

সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ শুরু হওয়া থেকে আকাশ পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ: সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত।

এই সালাতের পদ্ধতি:

এর রাকাত সংখ্যা হল দুই রাকাত, এতে প্রকাশ্যে কিরাত পড়তে হবে, তার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ক- তাকবীরে তাহরীমা বলবে, সানা পাঠ করবে, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়বে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, অতঃপর দীর্ঘ কিরাত পড়বে।

খ- তারপর দীর্ঘ রুকু করবে।

গ- এরপর রুকু থেকে উঠবে এবং বলবেঃ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه) (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ), অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ও দীর্ঘ কিরাত পাঠ করবে, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে সংক্ষিপ্ত হবে।

ঘ- এরপর দীর্ঘ রুকু করবে, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে সংক্ষিপ্ত হবে।

ঙ- তারপর রুকু থেকে উঠে (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه) (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলবে।

চ- অতঃপর দু'টি দীর্ঘ সিজদা করবে।

ছ- এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে, এই রাকাত প্রথম রাকাতের মতই, তবে তা প্রথম রাকাতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত হবে।

এই সালাতের সুন্নাতসমূহ:

ক) এর জন্য (الصلاة جامعة) (আস-সালাতু জামেয়া) বলে আহবান করা।

খ) তা জামাতে আদায় করা।

গ) এই সালাতের কিয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করা।

ঘ) দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত করা।

ঙ) সালাত শেষে নসীহা করা, ভালকাজ সম্পাদন ও খারাপকাজ পরিত্যাগে উৎসাহিত করা।

চ) অধিক পরিমাণে দোয়া, বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সাদকা করা।

অষ্টদশতম: সালাতুল ইস্তেসকা / বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত:

১) ইস্তেসকা হল: অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করা।

ইস্তেসকার সালাত আদায়ের সময়:

ইস্তেসকার সালাত আদায় করা হবে, যখন যমীন শুকিয়ে যায়, অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ক্ষতি সাধন হয়; তখন মানুষের আল্লাহর নিকট বিনয়ী হওয়া, তাঁর নিকট পানি প্রার্থনা করা ও বিভিন্ন উপায়ে মিনতির মাধ্যমে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

ক- এটা কখনো জামাতবদ্ধভাবে আবার কখনো একাকী সালাত আদায়ের মাধ্যমে হয়।

খ- কখনো জুমার খুতবায় দোয়ার মাধ্যমে; খতিব দোয়া করবেন আর মুসল্লীগণ আমিন বলবেন।

গ- আবার কখনো সালাত বা খুতবা ছাড়াই যে কোন সময় দোয়া করার মাধ্যমে হয়।

ইস্তেসকার সালাতের হুকুম:

এর কারণ দেখা দিলে তা আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন:

«خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজের চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন।)[1]

ইস্তেসকার সালাতের পদ্ধতি:

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১০১২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৮৯৪)।

ইস্তেসকার সালাতের পদ্ধতি ঈদের সালাতের ন্যায়। সুতরাং তা ঈদের সালাতের ন্যায় ঈদগাহে আদায় করা মুস্তাহাব, এর হুকুম-আহকাম ঈদের সালাতের হুকুম-আহকামের মতই; রাকাত সংখ্যা, প্রকাশ্য কিরাত পড়া, খুতবার পূর্বে তা আদায় করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর দেয়ার ক্ষেত্রে। যেমনটি পূর্বে ঈদের সালাতের বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে এতে একটিমাত্র খুতবা দিতে হবে।

উনিশতম: জানাযার বিধি-বিধান:

প্রথমত: যে ব্যক্তি কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়:

১- যে মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, তার জন্য সুন্নাত হলো তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله) এর তালকীন দেয়া।

২- মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিবলামুখী করে দেয়া।

৩- তার চোখ বন্ধ করিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

৪- মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া সুন্নাত।

৫- তাকে দ্রুত প্রস্তুত করা উচিত।

৬- তার ঋণ দ্রুত পরিশোধ করা আবশ্যক।

৭- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবে ও কাফন পড়াবে, এ দুটি কাজ ফরযে কিফায়া।

দ্বিতীয়ত: জানাযার সালাতের হুকম-আহকাম:

এর হুকুম হল: ফরযে কিফায়া

এর শর্তসমূহ:

১) কিবলামুখী হওয়া।

২) সতর ঢাকা।

৩) নাজাসাতমুক্ত হওয়া।

৪) মুসল্লী ও যার জানাযা পড়া হবে তাদের উভয়ের পবিত্রতা।

৫) উভয়ের মুসলিম হওয়া।

৬) এলাকায় হলে জানাযায় শরীক হওয়া।

৭) মুকাল্লাফ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

এর রুকনসমূহ:

১) তা দণ্ডায়মান অবস্থায় আদায় করা।

২) চার তাকবীর দেয়া।

৩) সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়া।

৫) মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করা।

৬) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৭) সালাম ফিরানো।

এই সালাতের সুন্নাতসমূহ:

১) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রফ‘উল ইয়াদাইন (দুই হাত উত্তোলন) করা।

২) আউযুবিল্লাহ পাঠ করা।

৩) নিজের ও মুসলিমদের জন্য দোয়া করা।

৪) চুপে চুপে কিরাত পড়া।

৫) চতুর্থ তাকবীরের পরে ও সালামের পূর্বে কিছুক্ষণ বিলম্ব করা।

৬) বুকের উপর ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখা।

৭) সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকে তাকানো।

এর পদ্ধতি:

ইমাম ও একাকী ব্যক্তি পুরুষের বুক বরাবর এবং নারীদের মাঝখান বরাবর দাঁড়াবে এবং তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এরপর আউযুবিল্লাহ পড়বে কিন্তু সানা পড়বে না, তারপর বিসমিল্লাহ বলবে ও সূরা ফতিহা পাঠ করবে।

এরপর তাকবীর দিবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়বে। এরপর আবার তাকবীর দিবে এবং মাইয়্যেতের জন্য বর্ণিত দোয়াটি পাঠ

করবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

উচ্চারণ:"আল্লাহুম্মাগফির লি-হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা, ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা। আল্লাহুম্মা মান আহয়াইতাহু মিন্না ফা-আহয়িহি আলাল ঈমান, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফা-তাওয়াফফাহু আলাল ইসলাম। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু, ওয়া লা তুদিল্লানা বা'দাহু।"

অর্থ: (হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, উপস্থিত ও অনুপস্থিত নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ঈমানের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবেন তাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং এর পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।)[1]

এবং তার বাণী:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ

1 সুনানে আবু দাউদ (হাদীস নং ৩২০১), তিরমিযী (হাদীস নং ১০২৪), ইমাম তিরমিযি বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস।

زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ».

উচ্চারণ:

“আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়া ‘আফিহি, ওয়া‘ফু ‘আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি’ মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমায়ি ওয়াস সালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতায়া কামা নাক্কাইতাছ-ছাওবাল-আবিয়াদ মিনাদ-দানাস, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহলান খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ‘ঈযহু মিন ‘আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ‘আযাবিন নারে।”

অর্থ:“হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন, তাকে নিরাপদ করুন, তার ভুল মাফ করুন, তার আতিথ্য সম্মানিত করুন, তার প্রবেশকে প্রশস্ত করুন, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে ফেলুন, তার পাপকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেন, তাকে তার বাড়ির চেয়ে উত্তম একটি গৃহ দিন, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দিন, তার স্ত্রীর থেকে উত্তম স্ত্রী দিন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।”[1] এরপর সে তাকবীর দিবে ও কিছু সময় বিলম্ব করবে, অতঃপর ডান দিকে একবার সালাম ফিরাবে।

তৃতীয় অধ্যায়: যাকাত প্রসঙ্গ:

১- যাকাতের পরিচয় ও তার গুরুত্ব:

যাকাত (الزكاة) শব্দের আভিধানিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হল: নির্দিষ্ট সম্পদের মাঝে সুনির্দিষ্ট লোকদের জন্য শরীয়তের পক্ষ হতে ওয়াজিব হক।

---

1 সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৯৬২)।

এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন, এটি কুরআনুল কারীমে বিরাশি (৮২) জায়গায় সালাতের সাথে যুক্ত, যা এর বিশাল গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ...﴾

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর...।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৩]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

(ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লায় হজ করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা।)[1]

মুসলিমগণ যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, এবং যারা এর আবশ্যকতাকে অস্বীকার করবে তাদের কুফরীর ব্যাপারে, এবং যারা তা আদায় করবে না তাদের সাথে লড়াই করার ব্যাপারেও (একমত পোষণ করেছেন)।

২- যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

ক) স্বাধীন হওয়া, সুতরাং কৃতদাসের উপর যাকাত ফরয নয়; কেননা প্রকৃত পক্ষে তার কোন সম্পদ নেই, তার কাছে থাকা সম্পদ তার মালিকের। সুতরাং উক্ত সম্পদের যাকাত তার মালিককে আদায় করতে হবে।

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১১১)।

খ) মুসলিম হওয়া: সুতরাং কাফিরের উপর তা ওয়াজিব নয়; কেননা এটি একটি ইবাদত ও আনুগত্যের কাজ, আর কাফির ব্যক্তি ইবাদত ও আনুগত্যকারী নয়।

গ) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া: সুতরাং নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে তা ওয়াজিব হবে না। আর তা হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকা।

ঘ) সম্পূর্ণ মালিকানা: অর্থাৎ সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির মালিকানাধীন হওয়া, সুতরাং যার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাকে যাকাত দিতে হবে না, যেমন মুকাতাবার ঋণ।

ঙ) সম্পদের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া: দলিল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদিস:

«لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

(বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।)[1]

যে সমস্ত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়:

প্রথমত: চতুষ্পদ জন্তু:

তা হল উট, গরু এবং ছাগল। এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে দুইটি শর্তে:

১- এগুলো লালন পালন করা হবে দুধ ও প্রজননের জন্য, কাজের জন্য নয়।

২- এগুলোকে সায়েমা হতে হবে অর্থাৎ তা উন্মুক্ত থাকতে হবে। (যেগুলো মাঠে চরে বেড়ায় এবং তার মালিক তাদের খাদ্য দেয় না।) সুতরাং এমন গবাদিপশুর ওপর যাকাত ফরজ হবে না, যেগুলোকে মালিক ক্রয়কৃত খাদ্য খাওয়ায়, অথবা ঘাস-পাতা কিংবা অন্যান্য খাদ্য একত্র করে খাওয়ায়।

[1] সুনানে ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ১৭৯২), তিরমিযী (হাদীস নং ৬৩, ৬৩১)।

অনুরূপভাবে যেসব প্রাণী পুরো বছর বা অধিকাংশ সময় নয় বরং বছরের কিছু সময় চড়ে বেড়ায় তাতেও যাকাত দিতে হবে না।

৪- চতুষ্পদ চন্তুর নিসাব:

১- উটের যাকাত:

যখন শর্তগুলো পূরণ হবে; তখন উটের সংখ্যা পাঁচটি হলে, তাতে একটি ছাগল, দশটি হলে দুইটি ছাগল, পনেরটি হলে তিনটি ছাগল, বিশটি হলে চারটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এর উপর হাদীস ও ইজমার দলীল রয়েছে। যখন উটের সংখ্যা পঁচিশটি হবে, তখন তাতে একটি বিনতু মাখাদ্ব তথা এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন উটনী যাকাত হবে, যদি তা না থাকে তবে ইবনে লাবুন যথেষ্ট হবে।

যখন উটের সংখ্যা ছত্রিশটি হবে; তখন তাতে একটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে তথা দুই বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উটনী।

যখন উটের সংখ্যা ৪৬ টি হবে; তখন তাতে একটি হিক্কাহ ওয়াজিব হবে তথা তিন বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উটনী।

যখন উটের সংখ্যা একষট্রি হবে; তখন তাতে একটি জিযআ ওয়াজিব হবে তথা চার বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উটনী।

যখন উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হবে; তখন তাতে দুইটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে।

যখন উটের সংখ্যা একানব্বইটি হবে; তখন তাতে দুইটি হিক্কাহ ওয়াজিব হবে।

যদি মোট উটের সংখ্যা একশ বিশের চেয়ে একটি বেশি হয়; তবে তাতে তিনটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ ওয়াজিব হবে।

২- গরুর যাকাত:

যখন শর্তগুলো পূরণ হবে, তখন গরুর সংখ্যা ত্রিশ হলে তাতে একটি তাবী বা তাবীয়া ওয়াজিব হবে; তথা এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন গরু।

ত্রিশের কম হলে কোন কিছু দিতে হবে না।

যদি গরুর সংখ্যা চল্লিশ হয়; তবে তাতে একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে; তথা দুই বছর পূর্ণ হয়েছে এমন গরু।

যখন মোট গরুর সংখ্যা চল্লিশের বেশি হবে; তখন প্রতি ত্রিশটিতে একটি তাবী বা তাবীয়া এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে।

৩- ছাগলের যাকাত:

যখন মোট ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হবে, তা ছাগল হোক বা ভেড়া হোক; তাতে একটি ছাগল দিতে হবে, তা হল একটি ভেড়ার বাচ্চা কিংবা একটি বকরী।

ছাগলের সংখ্যা চল্লিশের কম হলে তাতে যাকাত দিতে হবে না। যখন মোট ছাগলের সংখ্যা একশ একুশ হবে; তখন তাতে দুটি ছাগল দিতে হবে। যখন তার সংখ্যা দুইশ এক হবে; তখন তাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে।

যখন ছাগলের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হবে; তখন প্রতি শতকে একটি করে ছাগল দিতে হবে। অতেএব চারশটি হলে চারটি দিতে হবে, এভাবে... ।

দ্বিতীয়ত: যমীন থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

যমীন থেকে উৎপন্ন জিনিস দুই প্রকার:

১) শস্যদানা ও ফলমূল।

২) খনিজ পদার্থ।

প্রথম প্রকার: শস্যদানা ও ফলমূল:

শস্যদানায় যাকাত ওয়াজিব; যেমন গম, যব, ধান। ফলমূলেও ওয়াজিব হবে; যেমন খেজুর, কিসমিস। এর বাইরের অন্যান্য উদ্ভিদে যাকাত ওয়াজিব হবে না; যেমন শাক-সবজি ইত্যাদি।

শস্যদানা ও ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

১) এগুলোকে সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে: সুতরাং যা সংরক্ষণ করা যায় না তাতে যাকাত দিতে হবে না, যেমন ফলমূল ও শাক-সবজি।

২) এগুলো পরিমাপযোগ্য হতে হবে; সুতরাং যা গণনা করে বা ওজন করে বিক্রি করা হয় তাতে যাকাত দিতে হবে না; যেমন, তরমুজ, পেঁয়াজ, ডালিম ইত্যাদি।

৩) সেটা নিসাব পরিমাণ হতে হবে: তা হল পাঁচ ওসাক; সুতরাং এর কম হলে যাকাত দিতে হবে না।

৪) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানাধীন থাকতে হবে।

সুতরাং যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পরবর্তীতে যদি নিসাবের মালিক হয়, তবে তাকে যাকাত দিতে হবে না। যেমন সে ফসল আহরণের পর ক্রয় করল বা হাদিয়া পেল।

এসব জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়কাল:

শস্যদানাা ও ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হবে, যখন তা পরিপক্ক হওয়া শুরু হবে, এগুলোর পরিপক্ক হওয়ার আলামত নিম্নরূপ:

ক- শস্যদানা: যখন তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং দৃঢ় আকার ধারণ করে (অর্থাৎ পরিপক্ক হয়)।

খ- খেজুরের ক্ষেত্রে: যখন তা লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

গ- আঙ্গুরের ক্ষেত্রে: যখন তা নরম ও মিষ্ট হবে।

এগুলোর নিসাব:

শস্যদানা ও ফলমূলের নিসাব হল, পাঁচ ওসাক। এক ওসাক সমান ষাট সা, সুতরাং নিসাবের পরিমাণ হবে তিনশ সা, যা আধুনিক পরিমাপে প্রায় ৯০০ কেজি।

কতটুকু পরিমাণ যাকাত বের করা ওয়াজিব হবে:

যেসব ফসলের পিছনে কষ্ট বা অর্থ ব্যয় করে সেচ দিতে হয় না; যেমন বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার পানি দ্বারা হয়, সেগুলোতে দশভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে।

যেসব ফসলে কষ্ট বা অর্থ ব্যয় করে সেচ দিতে হয়; যেমন পশু বা আধুনিক মেশিন দ্বারা কূপ বা নদী থেকে পাম্প করে পানি সেচ দেয়া হয়, তাতে বিশভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: খনিজ পদার্থ:

যমীন থেকে প্রাপ্ত জিনিসের এক প্রকার হল: খনিজ পদার্থ তা হল যমীন থেকে মাটি জাতীয় বস্তু ছাড়া যা কিছু বের হওয়া; সোনা, রুপা, লোহা, মণিমুক্তা ইত্যাদি।

এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়:

যখন তা কেউ অর্জন করবে ও তা তার মালিকানায় চলে আসবে; তখন সাথে সাথে তার যাকাত আদায় করবে, এ ক্ষেত্রে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। এগুলো এবং সোনা-রুপার নিসাব হল: তার মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করবে।

তৃতীয়ত: মূল্যবান বস্তুর যাকাত:

মূল্যবান বস্তু বলতে সোনা, রুপা ও নগদ অর্থকে বুঝায়, এগুলোর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। দলীল: আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪]।

হাদীসে এসেছে:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي فِيهَا حَقَّهَا؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ».

(কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যদি এগুলোর হক (যাকাত) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিনে তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে।)[1]

ওলামাগণ সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছেন যে, সোনা ও রুপার উপর যাকাত ওয়াজিব এবং ব্যাংক নোটের হুকুম স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতই। কারণ এটি নগদ লেনদেনে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

মূল্যবান বস্তুর যাকাতের নিসাব ও তাতে যতটুকু যাকাত বের করা ওয়াজিব:

এগুলোর যাকাতের নিসাব হল স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবের ভিত্তিতে; কারণ এগুলো বর্তমানে অর্থমূল্য হিসেবে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থান দখল করেছে। তাই যখন নগদ অর্থের পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণে পৌঁছবে, তখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। বর্তমানে সাধারণত নগদ অর্থের নিসাব রৌপ্যের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়, কারণ রৌপ্য স্বর্ণের চেয়ে সস্তা—ফলে তার নিসাব আগে পৌছে যায়। অতএব, যদি কোনো মুসলমানের কাছে (৫৯৫ গ্রাম) রৌপ্যের সমমূল্যের সম্পদ থাকে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তাতে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। রূপার প্রতি গ্রামের মূল্য সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। তাই কারও কাছে যদি অল্প পরিমাণ অর্থ থাকে এবং সে নিশ্চিত না হয় যে তা নিসাব পরিমাণ হয়েছে কিনা, তাহলে সে রূপার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বর্তমানে রূপার প্রতি গ্রামের দাম জানবে, তারপর তা ৫৯৫ দিয়ে গুণ করবে। ফলে যে পরিমাণ

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৪০২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ২২৮৭)।

অর্থ পাওয়া যাবে, সেটাই হবে নিসাবের পরিমাণ।

ফায়দা: যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত দিতে চায়; সে নিসাবকে চল্লিশ দ্বারা ভাগ করবে, যে পরিমাণ হবে সেটা বের করা তার জন্য ওয়াজিব।

চতুর্থত: ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত:

তা হল, লাভের আশায় যেসব পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়, এটা নগদ অর্থ ছাড়া অন্য সব ধরনের সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে; যেমন গাড়ি, পোষাক, কাপড়, লোহা, কাঠ ইত্যাদি যা ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকৃত বস্তু।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

১- সে তার কর্মের দ্বারা এর মালিক হবে; যেমন বিক্রয়, ইজারা নেয়া ইত্যাদি উপার্জনের পদ্ধতির মাধ্যমে।

২- ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এর মালিক হবে; তথা তার দ্বারা উপার্জনের নিয়ত করবে, কেননা আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর ব্যবসা করাও একটি আমল, কাজেই তাতে অন্যান্য আমলের ন্যায় নিয়ত থাকা জরুরী।

৩- এগুলোর মূল্য নুন্যতম স্বর্ণ বা রৌপ্যের কোন একটির নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

৪- পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি:

বছর পূর্ণ হলে পণ্যগুলোকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের কোন একটির দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে, মূল্যায়নের পর যদি তা স্বর্ণ- রৌপ্যের কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয়; তাহলে তার মূল্য হতে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করতে হবে।

পঞ্চমত: যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা:

তা হল রমজানের শেষে ওয়াজিব সাদাকাহ, যা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয করা হয়েছে।

এর হুকুম:

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক ঐ মুসলিমের উপর যার নিকট ঈদের দিন ও ঈদের রাতে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। তা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব; পুরুষ-নারী, ছোট-বড়, স্বাধীন-পরাধীন সকলের উপর। দলীল এই হাদীস:

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

(প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।)[1] ফরয করেছেন অর্থ হল, আবশ্যক করেছেন।

এটি শরীয়তসম্মত হওয়ার হিকমত:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ».

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে সওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থা স্বরূপ।)[2]

তা ওয়াজিব হওয়া ও আদায় করার সময়:

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে ঈদের রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আর ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করা মুস্তাহাব। ঈদের সালাতের পর পর্যন্ত

---

1 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৪৩২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৯৮৪)।

2 সুনানে আবু দাউদ (হাদীস নং ১৬০৯) এবং ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ১৮২৭)। শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ আবু দাউদ (হাদীস নং ১৬০৯)-এ সহীহ বলেছেন।

বিলম্ব করা জায়েয নয়, যদি কেউ ঈদের সালাতের পর পর্যন্ত বিলম্ব করে; তার উপর কাযা হিসেবে তা বের করা ওয়াজিব এবং নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করার কারণে সে পাপী হবে।

ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বে তা আদায় করা জায়েয।

এর পরিমাণ এবং কোন কোন পণ্য দ্বারা তা আদায় করতে হবে:

নিজ দেশের প্রচলিত খাদ্য হতে এক সা পরিমাণ বের করতে হবে; যেমন চাউল, খেজুর, গম ইত্যাদি। এক সা এর পরিমাণ: প্রায় তিন কেজি। মূল্য দ্বারা তা আদায় করা জায়েয নয়; তথা খাবারের পরিবর্তে অর্থ দেওয়া; কেননা তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিপরীত।

যাকাত বের করা ও তা ব্যয়ের খাতসমুহ:

তা আদায় কারার সময়:

সময় হওয়ার সাথে সাথে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব, বিশেষ কারণ ছাড়া তা বিলম্ব করা জায়েয নয়; যেমন সম্পদ হয়ত কোন দূরের দেশে আছে এবং সেখানে দায়িত্ব দেয়ার মত কেউ নেই।

আদায় করার স্থান:

উত্তম হল যে দেশে সম্পদ আছে সে দেশে যাকাত আদায় করা, নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় ঐ দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করা জায়েয:

ক- যদি ঐ দেশে যাকাতের মুখাপেক্ষী কেউ না থাকে।

খ- যদি অন্য দেশে তার অভাবী কোন নিকট আত্মীয় থাকে।

গ- যদি কোন শরয়ী স্বার্থ থাকে যার কারণে এটা স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়, যেমন: দুর্ভিক্ষ ও বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম এলাকায় এটি স্থানান্তর করা।

শিশু ও পাগল ব্যক্তির সম্পদের উপরও যাকাত ওয়াজিব; সাধারন দলীলের ভিত্তিতে এবং তাদের আর্থিক অভিভাবকগণ তা আদায় করার দায়িত্ব নিবেন। নিয়ত ব্যতীত যাকাত আদায় করা জায়েয নয়, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

(নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।)[1]

যাকাতের হকদারগণ:

আট ধরণের ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা যাবে:

প্রথম প্রকার: ফকীর:

তারা হল, যাদের নিকট বাসস্থান, খাদ্য এবং বস্ত্রের মৌলিক চাহিদা পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পদ নেই। তাদেরকে যাকাত থেকে সে পরিমাণ দেয়া হবে যা তার ও তার পরিবারের এক বছরের জন্য যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: মিসকীন:

তারা হল, যারা প্রয়োজনীয় জিনিসের অধিকাংশ পায় কিন্তু পূর্ণরূপে পায় না, যেমন যে ব্যক্তির বেতন আছে কিন্তু তা তার সারা বছরের জন্য যথেষ্ট নয়।

তাদেরকে যাকাত হতে সে পরিমাণ দেয়া হবে যা তাদের ও তাদের পরিবারের এক বছরের জন্য যথেষ্ট হবে।

তৃতীয় প্রকার: যাকাত আদায়কারীগণ:

তারা হলেন, যাদেরকে সরকার যাকাত সংগ্রহের জন্য বা তা সংরক্ষণের জন্য কিংবা যাকাতের হকদারের নিকট পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়।

তাদেরকে যাকাত হতে দেয়া হবে তাদের পরিশ্রমের পারিশ্রমিকের সমান; যদি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে তাদের জন্য কোন প্রতিদান বা বেতনের ব্যবস্থা না থাকে।

চতুর্থ প্রকার: মুয়াল্লাফাতুল কুলূব (যাদের হৃদয় আকর্ষণ করার প্রয়োজন):

সে হল প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি দানের কারণে যার ইসলাম গ্রহণ, বা ঈমান শক্তিশালী হওয়া কিংবা মুসলিমদের থেকে তার অনিষ্ট প্রতিরোধের আশা করা

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১৯০৭)।

যায়।

তাদেরকে যাকাত হতে দেয়া হবে: যে পরিমাণ দিলে তাদের হৃদয় আকৃষ্ট হবে।

পঞ্চম প্রকার: দাসমুক্তকরণ:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: দাস ও মুকাতাবকে মুক্ত করা।

মুকাতাব হল মালিকের সাথে অর্থ বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলিমদেরকে মুক্ত করা।

ষষ্ঠ প্রকার: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, এরা দুই ধরণের:

প্রথম: যার উপর নিজের প্রয়োজনের কারণে ঋণ আছে এবং তা পরিশোধ করার মত তার নিকট কিছু নেই। তাকে তার ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ অর্থ দেয়া হবে।

দ্বিতীয়: অন্যের মাঝে আপোষ করিয়ে দেয়ার কারণে যার উপর ঋণ আছে, সে ব্যক্তি ধনী হলেও তাকে ঐ ঋণ পরিশোধ পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে।

সপ্তম প্রকার: আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ:

তারা হলেন যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন।

তাদেরকে যাকাত থেকে দেয়া হবে: যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য যথেষ্ট হবে; বাহন, অস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি।

অষ্টম প্রকার: মুসাফির:

সে এমন মুসাফির ব্যক্তি, সফরে যার অর্থ শেষ হয়ে গেছে কিংবা চুরি হয়ে গেছে; ফলে তার নিকট এমন অর্থ নেই যার দ্বারা সে তার শহরে পৌছতে পারে।

তাদেরকে যাকাত থেকে দেয়া হবে: এমন পরিমাণ যা তাকে তার শহরে পৌছে দিবে, যদি সে তার এলাকায় ধনী হয়।

চতুর্থ অধ্যায়: সওম প্রসঙ্গ

সিয়াম হল:

ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সওম ভঙ্গকারী সব ধরনের বস্তু থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

এটি ইসলামের অন্যতম রুকন, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ফরযকৃত বিধান, এবং দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। তা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিমদের ইজমা থেকে প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ...﴾

“রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

রমযানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

১- মুসলিম হওয়া, সুতরাং কাফেরের পক্ষ হতে তা বিশুদ্ধ হবে না।

২- প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুতরাং ছোটদের উপরে এটি ওয়াজিব নয়, তবে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম এমন শিশুদের পক্ষ হতে তা বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু তা নফল হিসেবে গণ্য হবে।

৩- জ্ঞানবান হওয়া, সুতরাং কোন পাগলের উপরে সিয়াম ওয়াজিব নয় এবং তার থেকে শুদ্ধও হবে না; নিয়ত না থাকার কারণে।

৪- সিয়াম পালনের সামর্থ থাকা, সুতরাং সিয়াম রাখতে অপারগ এমন রোগীর উপর তা ওয়াজিব নয়, মুসাফিরের উপরেও ওয়াজিব নয়, তারা উভয়ে অসুস্থতা

ও সফরের ওযর শেষ হয়ে গেলে তা কাযা করবে। নারীর সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল, হায়েয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া।

রমযান মাসের প্রবেশ সাব্যস্ত হয় দুটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে। তা হল:

ক- রমযান মাসের নতুন চাঁদ দেখা, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».

(তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু কর এবং চাঁদ দেখে ইফতার (অর্থাৎ সিয়াম শেষ) কর।)[1]

খ- শাবান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করার মাধ্যমে; যদি রমযানের চাঁদ না দেখা যায় কিংবা বৃষ্টি বা ধূলা বা অনুরূপ কিছুর কারণে তা দেখা না যায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا».

(আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে; তবে শাবান মাসের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।)[2]

সিয়ামের নিয়ত:

সিয়াম অন্যান্য ইবাদতের মতই, নিয়ত ব্যতীত তা শুদ্ধ হবে না, ওয়াজিব সিয়ামে নিয়ত ওয়াজিব হওয়ার সময় অন্যান্য সিয়াম হতে ভিন্ন হয়ে থাকে, তার বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথমত: ওয়াজিব সিয়াম; যেমন রমযান মাস, কাযা বা মানতের সিয়াম,

---

1 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৮১০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১০৮৬)।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৯০৯)।

এগুলোর নিয়ত ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে রাতে করা ওয়াজিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَن لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ».

(যে ব্যক্তি রাত্রে সিয়ামের নিয়ত না করে তার সিয়াম হয় না।)[1]

দ্বিতীয়ত: নফল সিয়াম, দিনের বেলায়ও এর নিয়ত করা বিশুদ্ধ, শর্ত হল, ফজর উদিত হওয়ার পর কোন খাবার গ্রহণ করতে পারবে না।

সিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমুহ:

এক. সহবাস করা: সুতরাং যে এ সময় সহবাস করবে তার সিয়াম বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তা কাযা করা আবশ্যক হবে, কাযা করার সাথে তাকে কাফফারাও আদায় করতে হবে, তা হল: দাসমুক্ত করা, যদি তা করার ক্ষমতা না থাকে, তবে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে, যদি শরয়ী ওযরের কারণে তা করতেও সক্ষম না হয়, তবে তাকে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে, প্রত্যেক মিসকিনকে দেশেরে প্রচলিত খাদ্যের অর্ধ সা পরিমাণ দিতে হবে।

দুই. বীর্যপাত ঘটানো: চুম্বন, স্পর্শ, স্বমেহন বা বারবার দৃষ্টিপাতের কারণে; তাহলে তাকে সিয়াম কাযা করতে হবে, কিন্তু কাফফারা দিতে হবে না, কেননা কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট। আর ঘুমন্ত ব্যক্তির যদি স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হয়; তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; কেননা তা তার ইচ্ছাধীন নয়, সুতরাং সে শুধু জানাবাতের গোসল করবে।

তিন. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা: কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

---

[1] মুসনাদে আহমাদ (হাদীস নং ২৬৪৫৭), সুনানে আবু দাউদ (হাদীস নং ২৪৫৪) ও সুনানে নাসায়ী (হাদীস নং ২৩৩১), শব্দগুলো তার থেকে নেয়া।

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ...﴾

"আর তোমরা খাও এবং পান করো যতক্ষণ না তোমাদের জন্য ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, তারপর তোমরা রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো...।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]

তবে যে ব্যক্তি ভুলবশত পানাহার করবে; তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; দলীল এই হাদীস:

«مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

(সিয়াম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে, তাহলে সে যেন তার সওম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।)[1]

চার. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। তবে কারো যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বমি হয়ে যায়; তাহলে তা তার সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

(কারো সিয়ামকালে অনিচ্ছকৃত বমি হলে তাকে কাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তবে তাকে কাযা করতে হবে।)[2]

পাঁচ: শরীর হতে রক্ত বের করা; হিজামার মাধ্যমে, শিরা কেটে রক্ত বের

---

1 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬৬৬৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ২৭০৯)।

2 সুনানে আবু দাউদ (হাদীস নং ২৩৮০), তিরমিযী (হাদীস নং ৭১৯), এবং ইবনু মাজাহ (হাদীস নং ৬৭৬)।

করার মাধ্যমে, অথবা কোনো রোগীকে সাহায্য করার জন্য রক্ত দান করার মাধ্যমে; এসব কারণে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে টেস্ট করার জন্য অল্প পরিমাণ রক্ত বের করলে, তা সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না, অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে রক্ত বের হলে; যেমন নাক দিয়ে বা ক্ষত স্থান হতে কিংবা দাত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে রক্ত বের হলে; তা সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

রমযান মাসে কাদের জন্য সিয়াম না রাখা জায়েয:

প্রথম প্রকার: যাদের সিয়াম না রাখা বৈধ এবং কাযা করা ওয়াজিব, তারা হল:

প্রথমত: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা করা যায়; কিন্তু সিয়াম পালন করা ক্ষতিকর বা কষ্টসাধ্য হয়।

দ্বিতীয়ত: মুসাফির ব্যক্তি; সফরে তার কষ্ট হোক বা না হোক।

এ দুটির দলীল হল: মহান আল্লাহর বাণী:

﴿...وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾

"তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে... ।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

তৃতীয়ত: গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মহিলা, যদি তাদের উপর সিয়াম কষ্টসাধ্য হয়, কিংবা তাদের বা তদের সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তারা অসুস্থ ব্যক্তির হুকুমে। সুতরাং তাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয, তবে পরবর্তী সময়ে তাদেরকে এই সওম কাযা আদায় করতে হবে।

চতুর্থত: হায়েযা ও প্রসূতি নারী, তাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা ওয়াজিব, তাদের সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না, তবে অন্য সময় তাদেরকে তা কাযা করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যাদের সিয়াম না রাখা বৈধ এবং তাদের কাযা করতে হবে না, বরং কাফফারা দেয়া ওয়াজিব, তারা হল:

প্রথমত: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত: এমন বয়োবৃদ্ধ যে সিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়।

এরা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং রমযান মাসের প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। তবে বয়স্ক ব্যক্তি যদি বিকারগ্রস্তের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তার উপর থেকে যিম্মাদারী দূর হয়ে যায়। সে তার সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং এতে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

কাযা করার সময় ও তা বিলম্ব করার হুকম:

রমযানের সিয়াম পরবর্তী রমযানের পূর্বে কাযা করা ওয়াজিব। তবে উত্তম হল দ্রুততম সময়ের মাঝে তার কাযা আদায় করা, পরবর্তী রমযানের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

(আমার উপর রমযানের যে কাযা থেকে যেত তা পরবর্তী শাবান ছাড়া আমি আদায় করতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ব্যস্ততার কারণে।)[1]

সুতরাং কোন ব্যক্তি পরবর্তী রমাদানের পর পর্যন্ত বিলম্ব করলে তার দু’টি অবস্থা:

১- সে হয়ত বিলম্ব করেছে কোন শরয়ী ওযরের কারণে, যেমন: তার অসুস্থতা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; এ ধরণের ব্যক্তিকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করতে হবে।

২- সে বিলম্ব করেছে কোন শরয়ী ওযর ছাড়াই। এ ধরণের ব্যক্তি বিলম্ব করার

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৮৪৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১৮৪৬)।

কারণে পাপী হবে এবং তার উপর তাওবা করা, কাযা করা ও প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দেয়া ওয়াজিব।

যার উপর কাযা সিয়াম রয়েছে তার জন্য নফল সিয়াম:

যার উপর রমযানের কোন সিয়াম কাযা রয়েছে; তার জন্য উত্তম হল, নফল সিয়ামের পূর্বে তা দ্রুত আদায় করে নেয়া, তবে যদি নফল সিয়াম এমন হয় যে, তার সময়সীমা পার হয়ে যাবে -যেমন আরাফার সিয়াম ও আশুরার সিয়াম-; তবে সে কাযা করার পূর্বে ঐ সিয়াম রাখবে; কেননা কাযা আদায় করার সময় প্রশস্ত, পক্ষান্তরে আরাফা ও আশুরার সিয়াম ঐ দিনে না রাখলে হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম কাযা আদায় করার পূর্বে রাখবে না।

যে সময় সিয়াম রাখা হারাম:

১- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে সিয়াম রাখা; কেননা এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

২- যিলহজ মাসের তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম রাখা, তবে তামাত্ত বা কিরান হজ আদায়কারী যদি কুরবানী না পায়, তাহলে তার বিধান ভিন্ন। তাশরীকের দিনগুলো হল: যিলহজ মাসের এগার, বারো ও তেরো তারিখ।

৩- সংশয়ের কারণে সন্দেহের দিনে সিয়াম রাখা, আর তা হল শাবান মাসের ত্রিশ তারিখ, যদি সে রাতে মেঘ বা ধূলার কারণে নতুন চাঁদ দেখা না যায়।

যে সময় সিয়াম রাখা মাকরূহ:

ক- শুধুমাত্র রজব মাসে সিয়াম রাখা। খ- শুধুমাত্র জুমার দিনে সিয়াম রাখা, কেননা এ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে যদি এর সাথে পূর্বে বা পরে একদিন সিয়াম রাখে তবে তা আর মাকরূহ থাকবে না।

যেসব দিনে সিয়াম পালন করা সুন্নাত:

ক- শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করা। খ- যিলহজ মাসের প্রথম নয় দিন সিয়াম রাখা, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আরাফার দিনে সিয়াম রাখা,

হাজী ব্যতীত অন্যদের জন্য। কেননা হাজীদের জন্য এই দিন সিয়াম পালন করা সুন্নাত নয়। এই দিনের সিয়াম (আগে পরের) দুই বছরের গুনাহর কাফফারা স্বরূপ। গ- প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা। আর উত্তম হল, তা আইয়ামে বীয তথা মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রাখা। ঘ- প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই দিন সিয়াম পালন করতেন এবং তাকে জানানো হয়েছিল যে, বান্দার আমলসমূহ এই দুই দিন আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়।

নফল সিয়াম:

ক- দাউদ আলাইহিস সালামের মত সিয়াম পালন করা, তিনি একদিন সিয়াম রাখতেন আর একদিন ভঙ্গ করতেন।

খ- পবিত্র মুহাররম মাসে সিয়াম পালন, এই মাস মুস্তাহাব সিয়ামের সর্বোত্তম মাস। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল: আশুরার দিনে সিয়াম রাখা, তা হল মুহাররম মাসের দশম তারিখ। তার সাথে নবম তারিখ সিয়াম রাখবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ».

(আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে মুহাররম মাসের নবম তারিখও সিয়াম রাখব।)[1] এটি পূর্বের এক বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ।

পঞ্চম অধ্যায়: হজ ও উমরা প্রসঙ্গ:

হজের আভিধানিক অর্থ: ইচ্ছা পোষণ করা। শরয়ী পরিভাষায়: নির্দিষ্ট সময়ে, হজের নির্দিষ্ট আমলের দ্বারা পবিত্র বাইতুল্লাহ এবং পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করা।

---

[1] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১১৩৪)।

উমরার আভিধানিক অর্থ: যিয়ারত করা।

শরয়ী পরিভাষায়: বিশেষ কার্যাদি পালন করার জন্য বছরের যে কোন দিন মসজিদে হারামের যিয়ারত করা।

হজ ইসলামের অন্যতম রুকন ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তা নবম হিজরীতে ফরয করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হজ আদায় করেছেন; যা বিদায় হজ নামে পরিচিত।

সামর্থবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ওয়াজিব, এর বেশি করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর উমরা অনেক ওলামার মতে ওয়াজিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার উপর ভিত্তি করে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: নারীদের উপর কি জিহাদের বিধান রয়েছে? তিনি বলেছিলেন:

«نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ».

(হ্যাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরজ, তবে তাতে অস্ত্রবাজি নাই। তা হচ্ছে হজ ও উমরা।)[1]

হজ ও উমরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী:

১- ইসলাম।

২- বিবেক-বুদ্ধি।

৩- প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৪- স্বাধীন হওয়া।

৫- সামর্থবান হওয়া।

নারীদের জন্য অতিরিক্ত ষষ্ঠ শর্ত হল; সাথে মাহরাম থাকা- যে তার সাথে

---

1 মুসনাদে আহমাদ (হাদীস নং ২৫১৯৮), সুনানে নাসায়ী (হাদীস নং ২৬২৭), ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ২৯০১)।

হজ আদায়ে সঙ্গী হবে। কারণ হজ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাদের জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা বৈধ নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».

(নারীরা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট প্রবেশ করতে পারবে না।)[1]

নারীর মাহরাম হল, তার স্বামী অথবা যার সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ; বংশীয় কারণে; যেমন তার ভাই, পিতা, চাচা, ভাতিজা ও মামা, অথবা বৈধ কারণে, যেমন দুধভাই, অথবা বিবাহের মাধ্যমে; যেমন তার সৎ বাবা ও তার সৎপুত্র।

সামর্থবান হওয়ার অর্থ হল: আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা অর্থাৎ সে আরোহন করতে ও সফরের কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হবে এবং তার নিকট এমন সম্পদ থাকবে যা তার যাওয়া আসার জন্য যথেষ্ট হবে। সাথে সাথে তার সন্তানদের ও পরিবারের জন্য তার ফিরে আসা পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা থাকবে।

এবং হজের পথ তার ও তার সম্পদের জন্য নিরাপদ হবে।

আর যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে সক্ষম কিন্তু শারীরিকভাবে নয়; যেমন অতি বৃদ্ধ বা এমন দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত যা থেকে সুস্থতার আশা করা যায় না; তাহলে তার জন্য অন্যকে তার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা করার দায়িত্ব দেয়া আবশ্যক।

যে ব্যক্তি বদল হজ বা উমরা করবে তার পক্ষে তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত:

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৮৬২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১৩৪১)।

১- তাকে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যাদের হজ শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাকে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

২- তাকে নিজের পক্ষ থেকে আগে ফরয হজ আদায় করতে হবে।

হজের ইহরামের মিকাতসমূহ

মিকাতের আভিধানিক অর্থ হল: সীমা

আর শরীয়তের পরিভাষায়: তা হল ইবাদতের স্থান বা সময়।

হজের সময়কেন্দ্রিক ও স্থানকেন্দ্রিক মিকাত রয়েছে:

ক- সময়কেন্দ্রিক মিকাত: আল্লাহ তায়ালা এর বর্ণনা করে বলেন:

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ...﴾

"হজ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। সুতরাং যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করার মনস্থির করে... ।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

এই মাসগুলো হল, শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন।

খ- স্থানকেন্দ্রিক মিকাত: সে সমস্ত সীমা যা মক্কার উদ্দেশ্যে গমনকারী হাজীদের জন্য ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েয নয়। এগুলো হল নিম্নরূপ:

১- যুল হুলাইফা: মদিনাবাসীর মিকাত।

২- জুহফা: মিশর, মরক্কো ও সিরিয়াবাসীদের মিকাত।

৩- কারনুল মানাযেল: এটি বর্তমানে 'সাইল' নামে পরিচিত; এটি নাজদবাসীর মিকাত।

৪- যাতু ইরক: ইরাকবাসীদের মিকাত।

৫- ইয়ালামলাম: ইয়ামানবাসীদের মিকাত।

যার বাড়ী এই স্থানগুলোর অভ্যন্তরে হবে; সে হজ ও উমরার জন্য তার নিজ বাড়ী থেকেই ইহরাম বাঁধবে। আর মক্কাবাসীগণ মক্কা হতেই ইহরাম বাঁধবেন, ইহরাম বাঁধার জন্য তাদের মিকাতের উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে উমরার ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে নিকটবর্তী হিল (তথা তানয়ীম বা আরাফা বা জু'রানায়) বের হবেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। যে ব্যক্তি হজ বা উমরা করতে চায় তাকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত স্থানগুলো থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে। আর তা হল স্থানকেন্দ্রিক মিকাত যা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই হজ বা উমরার নিয়তকারীর জন্য ইহরাম ব্যতীত এই স্থানগুলো অতিক্রম করা জায়েয নয়।

- উল্লেখিত স্থানের অধিবাসীরা ছাড়া যারা এই মিকাতগুলো দিয়ে অতিক্রম করবে; তারা সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে।

- যে ব্যক্তি মক্কায় যাওয়ার পথে উল্লিখিত মিকাতগুলোর কোন একটি দিয়ে স্থল, সমুদ্র বা আকাশপথে অতিক্রম করবে না; সে তার সবচেয়ে নিকটবর্তী মিকাতের বরাবর হওয়ার সময় ইহরাম বাঁধবে। উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই বাণীর কারণে: (তাহলে তোমরা লক্ষ্য কর তোমাদের পথে কারনুল মানাযিল-এর সমরেখা কোন স্থানটি)[1]

- যে ব্যক্তি হজ বা উমরা পালন করতে বিমানে সফর করবে, তার জন্য মিকাত বরাবর বিমান অতিক্রম করার সময় ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। তার জন্য বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ পর্যন্ত ইহরাম বিলম্ব করা জায়েয নয়।

ইহরাম বাঁধা:

তা হল ইবাদতে (হজ বা উমরায়) প্রবেশের নিয়ত; সুতরাং হজের ক্ষেত্রে তা হজে প্রবেশের নিয়ত। আর উমরার ক্ষেত্রে তা উমরায় প্রবেশের নিয়ত। হজ বা উমরায় প্রবেশের নিয়ত না করা পর্যন্ত সে মুহরিম হিসেবে গণ্য হবে না। নিয়ত ছাড়া শুধুমাত্র ইহরামের কাপড় পরিধান করা ইহরাম হিসেবে ধর্তব্য নয়।

ইহরামের মুস্তাহাবসমূহ:

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৫৩১)।

১- ইহরামের পূর্বে পূর্ণরূপে গোসল করা।

২- শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইহরামের কাপড়ে নয়।

৩- সাদা লুঙ্গি ও চাদর এবং এক জোড়া জুতা পরিধান করে ইহরাম বাঁধা।

৪) আরোহন অবস্থায় থাকলে কিবলামুখী হয়ে ইহরাম বাঁধা।

হজের প্রকারভেদ:

হজ তিন প্রকার, হজের ইচ্ছা পোষণকারী যেকোন প্রকার আদায় করতে পারে, তা হল:

১- তামাত্ত হজ; তা হল হজের মাসগুলোতে প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধবে ও তা সমাপ্ত করবে, অতঃপর সে ঐ বছরেই হজের ইহরাম বাঁধবে।

২- ইফরাদ হজ; তা হল মিকাত থেকে শুধুমাত্র হজের ইহরাম বাঁধবে এবং হজ সম্পাদন করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে।

৩- কিরান হজ: তা হল হজ ও উমরার একসাথে ইহরাম বাঁধবে, অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তার সাথে হজ অন্তর্ভুক্ত করবে। কাজেই সে উমরা ও হজের নিয়ত মিকাত থেকে করবে অথবা উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে করবে এবং হজ ও উমরা উভয়ের জন্য তাওয়াফ ও সায়ী করবে।

তামাত্ত ও কিরান হজ আদায়কারীকে কুরবানী দিতে হবে, যদি সে মক্কার অধিবাসী না হয়।

এই তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম হল তামাত্ত হজ, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন, অতঃপর কিরান হজ; কেননা এর মাঝে হজ ও উমরা রয়েছে, অতঃপর ইফরাদ হজ।[1]

গ) যখন এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের ইহরাম বাঁধবে,

---

1 সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১২১১)।

এর নিয়তান্তে সে তালবীয়া পাঠ করবে আর বলবে:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

উচ্চারণ: "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারীকা লাক।"

(আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।)[1]

তালবীয়া পাঠ করা সুন্নাত, তা অধিক পরিমাণে পাঠ করা মুস্তাহাব; পুরুষরা তা জোরে পড়বে আর নারীরা আস্তে পড়বে।

তা পাঠের সময়সীমা: এর সময় শুরু হবে ইহরাম বাঁধার পর হতে, আর শেষ সময় নিম্নরূপ:

প্রথমত: উমরা আদায়কারী তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তা শেষ করবে।

দ্বিতীয়ত: হজ আদায়কারী ঈদের দিন জামারায়ে আকাবায় যখন পাথর নিক্ষেপ শুরু করবে তখন থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ:

এক. শরীরের যে কোন জায়গা থেকে চুল মুণ্ডন করা, ছোট করা বা ছিঁড়ে ফেলা।

দুই. বিনা ওযরে হাত বা পায়ের নখ কাটা বা খাটো করা। তবে যদি নখ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তা অপসারণ করে তবে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে না।

তিন. পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা- এমন বস্তু দিয়ে যা মাথায়ে লেগে থাকে,

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ১৫৪৯)।

যেমন: টুপি ও গুতরা।

চার. পুরুষের শরীরে বা কোন অংশে সেলাই করা পোষাক পরা, যেমন জামা, পাগড়ি বা পায়জামা। সেলাই করা পোশাক হল: যা কোন অঙ্গের মাপে তৈরি করা হয়, যেমন মোজা, হাতমোজা, কাপড়ের তৈরী মোজা ইত্যাদি। তবে নারীরা ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাধীন পোশাক পরিধান করবে তাদের পর্দার প্রয়োজনীয়তার কারণে, কিন্তু সে হিজাব পরতে পারবে না, অপরিচিত পুরুষ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে ওড়না বা চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে নিবে। আর হাতমোজাও পরিধান করবে না।

পঞ্চম: সুগন্ধি ব্যবহার; কেননা মুহরিম ব্যক্তি থেকে প্রত্যাশিত হল, দুনিয়ার বিলাসিতা, সাজসজ্জা ও উপভোগ থেকে দূরে থাকা এবং পরকাল অভিমুখী হওয়া।

ছয়. স্থলভাগের শিকার হত্যা করা বা শিকার করা। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি স্থলের কোন শিকার ধরতে পারবে না, তাতে সহযোগিতা করতে পারবে না এবং তা যবেহ করতেও পারবে না।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য যা সে নিজে শিকার করেছে, বা তার জন্য শিকার করা হয়েছে বা শিকার করতে সহযোগিতা করেছে তা খাওয়া হারাম; কেননা তা তার জন্য মৃত প্রাণীর ন্যায়।

তবে পানির শিকার; মুহরিমের জন্য তা শিকার করা হারাম নয় এবং তার জন্য পালিত প্রাণী জবেহ করাও হারাম নয়, যেমন মুরগী, চতুষ্পদ প্রাণী; কেননা তা শিকার নয়।

সাত. নিজের বা অন্যের বিবাহের আকদ সম্পন্ন করা অথবা তাতে সাক্ষী হওয়া।

আট. সহবাস করা; যে ব্যক্তি প্রথম হালাল হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে; তার হজ বাতিল হয়ে যাবে এবং এই হজ চলমান রাখা ও পূর্ণ করা আবশ্যক হবে,

পরবর্তী বছর তাকে কাযা করতে হবে এবং তাকে দম দিতে হবে। আর যদি প্রথম হালালের পর হয়; তবে তার হজ বাতিল হবে না কিন্তু তাকে দম দিতে হবে।

এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মতই যদি সে তা স্বেচ্ছায় করে।

নবম: লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্য জায়গায় আলিঙ্গন করা; মুহরিমের জন্য স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা জায়েয নয়; কেননা তা নিষিদ্ধ মিলনের একটি মাধ্যম। আলিঙ্গন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রবৃত্তির সাথে স্ত্রীকে স্পর্শ করা।

উমরাহ প্রসঙ্গ:

ক- উমরার রুকনসমূহ:

১- ইহরাম বাঁধা।

২- তাওয়াফ করা।

৩- সায়ী করা।

খ- উমরার ওয়াজিবসমূহ:

১- গ্রহণযোগ্য মিকাত হতে ইহরাম বাঁধা।

২- মাথার চুল মুণ্ডন করা বা খাটো করা।

গ) উমরার পদ্ধতি:

প্রথম যে কাজটি উমরা আদায়কারী শুরু করবে তা হল, সাতবার তাওয়াফ করবে, হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করবে। তাওয়াফের সময় সে অযু অবস্থায় থাকবে এবং হাঁটু পর্যন্ত সতর ঢেকে রাখবে। সম্পূর্ণ তাওয়াফে তার ইযতেবা করা সুন্নাত; আর তা হল, ডান কাঁধ খোলা রাখা ও চাদর কাঁধের নিচে দেয়া এবং চাদরের উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখা। যখন সপ্তম চক্কর শেষ হয়ে যাবে তখন ইযতেবা পরিহার করবে এবং তার চাদর দিয়ে উভয় কাঁধ ঢেকে নিবে।

সে হজরে আসওয়াদ বরাবর হবে, যদি তা চুম্বন করতে সক্ষম হয় তবে করবে, যদি না হয় তবে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং স্বীয় হাত চুম্বন করবে।

যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করতে সক্ষম না হয়, তবে ডান হাত উত্তোলন করে ইশারা করবে এবং একবার 'আল্লাহু আকবার' (الله أكبر) বলবে, এমতবস্থায় তার হাত চুম্বন করবে না এবং দাঁড়াবেও না। এরপর কাবাকে বাম পাশে রেখে তার তাওয়াফ চলমান রাখবে, আর প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত, রমল হল: ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুতগতিতে হাঁটা।

যখন সে রুকনে ইয়ামানী অতিক্রম করবে- এটা কাবার চতুর্থ রুকন- তখন যদি সম্ভব হয় তবে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে, কিন্তু সেখানে তাকবীর দিবে না এবং চুম্বনও করবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে সে চলে যাবে, ইশারাও করবে না, তাকবীরও দিবে না। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবে:

﴿...رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

"...হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন ও আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

তাওয়াফ শেষ করার পর; সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, আর সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যেকোন স্থানে আদায় করে নিবে। আর প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল-কাফিরুন পড়া সুন্নাত, এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল-ইখলাস পড়া। তারপর সায়ীর স্থানে যাবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দিবে; যাওয়া একটি চক্কর এবং ফিরে আসা একটি চক্কর হিসেবে গণ্য হবে।

সায়ী সাফা পর্বত হতে শুরু করবে, এতে উঠবে বা সেখানে দাঁড়াবে, সম্ভব হলে সাফার উপর উঠা উত্তম। এ সময় সে আল্লাহ তায়ালার এই বাণী পাঠ করবে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ...﴾

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত...।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮]

তার জন্য মুস্তাহাব হল, কিবলামুখী হওয়া, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করা ও তাকবীর দেয়া এবং এই দোয়া বলা:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

উচ্চারণ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ি ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।"

অর্থ: (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মালিকানা তাঁর, তিনি সকল প্রশংসার প্রকৃত হকদার। তিনি জীবন-মৃত্যুদানকারী এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক। তিনি একাই তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (বিদ্রোহী) বাহিনীকে বিতাড়িত ও পরাভূত করেছেন।)[1] তারপর উভয় হাত উঁচু করে যা সহজসাধ্য তা দ্বারা দু'আ করবে। আর এই যিকর ও দু'আ তিনবার পুনরাবৃত্তি করবে। তারপর সাফা থেকে নেমে মারওয়ার দিকে রওনা

[1] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ১২১৮)।

করবে, এমনকি যখন প্রথম চিহ্নের নিকট পৌছবে তখন পুরুষরা দ্বিতীয় চিহ্নের আগ পর্যন্ত দ্রুত হাঁটবে। তবে নারীদের জন্য এখানে দ্রুত হাঁটার বিধান নেই; কেননা সে আবৃত থাকার প্রতি আদিষ্ট। তারা পুরো সায়ীতে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। এরপর চলতে থাকবে এমনকি মারওয়ায় উঠে সেখানে দাঁড়াবে, সম্ভব হলে মারওয়ার উপর আরোহন করা উত্তম। মারওয়ার উপর সেসব আমল করবে ও দোয়া বলবে যা সাফার উপর করেছে। তবে এ আয়াতটি পাঠ করবে না:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ...﴾

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত...।" এটি শুধুমাত্র প্রথমবার সাফা পর্বতে আরোহনের সময় পাঠ করা শরীয়তসিদ্ধ। এরপর মারওয়া থেকে নামবে এবং হাঁটার স্থানে হাঁটবে আর দ্রুত চলার স্থানে দ্রুত চলবে, এভাবে সাফায় গিয়ে পৌঁছবে। এরূপ সাতবার করবে, যাওয়া একটি চক্কর এবং ফিরে আসা একটি চক্কর হিসেবে গণ্য হবে। সায়ীর সময় যথা সম্ভব বেশি বেশি যিকির ও দোয়া করা মুস্তাহাব। এবং ছোট-বড় সকল ধরণের অপবিত্রতা হতে পবিত্র হবে, তবে যদি অযু ছাড়াই সায়ী করে তবে তা জায়েয হবে। অনুরূপভাবে নারী যদি তাওয়াফের পর হায়েয বা প্রসূতি হয়; তবে সে সায়ী করে নিবে এবং তা তার জন্য যথেষ্ট হবে; কেননা সায়ীর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়, বরং তা মুস্তাহাব।

সায়ী সম্পূর্ণ করার পর; মাথার চুল মুণ্ডন করবে বা ছোট করবে। তবে পুরুষদের জন্য মুণ্ডন করাই উত্তম।

এর মাধ্যমে ব্যক্তির উমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

হজ প্রসঙ্গ:

ক- হজের রুকনসমূহ:

১- ইহরাম বাঁধা।

২- আরাফায় অবস্থান করা।

৩- তাওয়াফে ইফাযা করা।

৪- সায়ী করা।

খ- হজের ওয়াজিবসমূহ:

১- মিকাত হতে ইহরাম বাঁধা।

২- যিলহজ মাসের নয় তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা; যে ব্যক্তি সেখানে দিনের বেলায় অবস্থান করবে তার জন্য।

৩- যিলহজ মাসের দশ তারিখ রাতে মধ্য রাত পর্যন্ত মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা।

৪- তাশরীকের দিনগুলোতে রাতে মিনায় রাত্রী যাপন করা।

৫- জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা।

৬- মাথার চুল মুণ্ডন করা বা খাটো করা।

৭- বিদায়ী তাওয়াফ করা।

গ- হজের বিবরণ:

যখন মুসলিম ব্যক্তি হজের জন্য মীকাতে পৌঁছবে এবং সময় স্বল্প থাকলে 'ইফরাদ' হজ করার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে। এরপর মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ ও সায়ী করবে, কিন্তু ইহরাম থেকে মুক্ত হবে না। অতঃপর ৯ই জিলহজ আরাফার দিন আরাফায় যাবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে।

অতঃপর হাজীগণ তালবিয়া পাঠ করতে করতে আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওনা হবেন। সেখানে ফজরের সালাত আদায় পর্যন্ত অবস্থান করবেন। ফজর আদায়ের পর আল্লাহর যিকির, তালবিয়া ও দোয়া করতে করতে সকালের আলো ভালোভাবে ফুটে উঠা পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন।

যখন সকালের আলো ভালোভাবে ফুটে উঠবে তখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছে 'জামরাতুল আকাবায় সাতটি কঙ্কর মারবেন। এরপর মাথা মুণ্ডন করবেন বা চুল কাটবেন; তবে মুণ্ডন করাই উত্তম।

এরপর 'তাওয়াফে ইফাযা' (হজের মূল তাওয়াফ) সম্পন্ন করবেন। তবে আগে করা সায়ী তার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে তার হজ সম্পন্ন হবে এবং তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ইহরাম থেকে মুক্ত (হালাল) হবেন।

এরপর তার উপর বাকী থাকবে একাদশ ও দ্বাদশ দিনে তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা– যদি সে তাড়াহুড়া করে (অর্থাৎ ১২ তারিখে সন্ধ্যার আগে মিনা ত্যাগ করে) | সে প্রতিটি জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে। সে শুরু করবে ছোট জামরা দিয়ে যা মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী, তারপর মধ্যম জামরা, তারপর জামরাতুল আকাবা যা সর্বশেষ। প্রতিটি জামরায় সে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। আর যদি কেউ দ্বাদশ তারিখের পরেও মিনায় অবস্থান করতে চায় (অর্থাৎ বিলম্ব করে), তবে তাকে ত্রয়োদশ তারিখেও কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে, ঠিক যেভাবে একাদশ ও দ্বাদশ তারিখে নিক্ষেপ করেছিল।

পাথর নিক্ষেপের সময়: এই তিন দিন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে।

আর যদি কেউ দ্বাদশ তারিখে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করে, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কেউ থেকে গিয়ে ত্রয়োদশ তারিখে যোহরের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তবে এটি উত্তম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿...فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ...﴾

"অতঃপর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই- এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে... |"

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

অতঃপর যদি সে সফর করতে চায়; তবে সাত চক্কর দিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করে নিবে, কিন্তু সায়ী করবে না।

আর যদি তার সাথে কুরবানীর পশু না থাকে, তাহলে উত্তম হল, সে উমরাহর ইহরাম বেঁধে 'তামাত্তু' হজ করবে। অতঃপর ৮ই জিলহজ হজের নিয়ত করবে এবং পূর্বে বর্ণিত হজের সকল কাজ সম্পাদন করবে। আর যদি সে হজ ও উমরাহ একসাথে ইহরাম বাঁধে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এটিকে 'কিরান' বলা হয়, তা হল, সে একটি তাওয়াফ ও একটি সায়ী মাধ্যমে উমরাহ ও হজ উভয়ই আদায় করার ইহরাম বাঁধবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
পারস্পরিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

ওলামাগণ- আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন- যে সমস্ত আবশ্যকীয় ইলম প্রত্যেকের শিক্ষা লাভ করা ফরয তা বর্ণনা করেছেন। কতটুকু ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে আইন, তাও তারা আলোচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে তারা উল্লেখ করেছেন: যিনি ব্যবসা করেন তার জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম শিক্ষা করা, যেন সে অজ্ঞাতসারে হারাম কিংবা সুদের মধ্যে পতিত না হয়। কোন কোন সাহাবা থেকে এর স্বপক্ষে প্রমাণ এসেছে।

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "আমাদের বাজারে সে-ই ব্যবসা করবে, যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে।"[1]

আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: (যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পূর্বে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়বে; সে সুদের মধ্যে পতিত হবে, অতঃপর সুদের মধ্যে পতিত হবে, অতঃপর সুদের মধ্যে পতিত হবে। অর্থাৎ সুদে জড়িয়ে

[1] সুনানে তিরমিযী (৪৮৭), তিনি হাদিসটিকে হাসান গরিব বলেছেন এবং শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

যাবে।)[1]

ইবনু আবেদীন আলামী থেকে বর্ণনা করে বলেন: "দ্বীন ও হেদায়েতের জ্ঞান শিক্ষা করার পর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর জন্য ফরয হল, অযু, গোসল, সালাত ও সিয়ামের ইলম শিক্ষা করা, যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে তাদের জন্য যাকাতের ইলম শিক্ষা করা, যাদের উপর হজ ওয়াজিব তাদের জন্য হজের ইলম শিক্ষা করা, এবং ব্যবসায়ীদের জন্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ইলম শিক্ষা করা, যাতে তারা সমস্ত লেনদেনে সন্দেহ ও আপত্তিকর বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে পারে। অনুরূপভাবে পেশাজীবিগণ সহ প্রত্যেকেই যারা কোন কাজে নিয়োজিত তাদের জন্য এ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করা ফরয; যেন হারাম বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারে।"[2]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: "আর বিক্রয়-বাণিজ্য, বিবাহ এবং এ জাতীয় যেসব আমল আসলেই ফরজ নয়- এসবের শর্তসমূহ জানা ছাড়া এগুলোতে প্রবেশ করা হারাম।"[3]

আর্থিক লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নীতিমালা, যা ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

১- যেসব কাজে সম্পূর্ণ বা প্রাধান্যপূর্ণ কল্যাণ নিহিত আছে, সেগুলোকে বৈধ করা হয়েছে; যেমন—বৈধ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা দেয়া ও শুফআ (অগ্রক্রয়াধিকার)।[4]

---

1 দেখুন: মুগনিল মুহতাজ (২/২২)।

2 দেখুন: হাশিয়া ইবনে আবেদীন (১/৪২)।

3 দেখুন: আল-মাজমু (১/৫০)।

4 শুফ'আ: (বাড়ি, জমি ইত্যাদি এজমালী সম্পত্তি হতে) কেউ নিজের অংশ বিক্রি করলে অপর শরীকের (অথবা বাড়ী বা জমির সংলগ্ন থাকার কারনে প্রতিবেশীর) উক্ত বিক্রয় মূল্যে খরিদ করার যে অগ্রাধিকার শরীয়ত প্রদান করেছে, তাকে শুফ'আ বলে।

২- প্রত্যেক বিষয় যাতে মানুষের হকের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ রয়েছে তা শরীয়ত সম্মত; যেমন বন্ধক রাখা ও সাক্ষী রাখা।

৩- প্রত্যেক যাতে উভয় পক্ষের কল্যাণ রয়েছে তা শরীয়তসিদ্ধ; যেমন বাতিল করা, এখতিয়ার থাকা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে শর্তসমূহ।

৪- প্রত্যেক যাতে মানুষের প্রতি যুলুম রয়েছে বা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদের ভক্ষণ রয়েছে তা নিষিদ্ধ; যেমন সুদ, জবরদখল ও মজুতকরণ।

৫- প্রত্যেক যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা রয়েছে তা শরীয়তসিদ্ধ; যেমন ঋণ প্রদান, ধার দেয়া ও আমানত রাখা।

৬- প্রত্যেক বিষয় যাতে কর্ম নেই এবং উপকার বা পরিশ্রম ছাড়া সম্পদ ভক্ষণকে শামিল করে তা নিষিদ্ধ; যেমন জুয়া ও সুদ।

৭- প্রত্যেক লেনদেন যাতে অজ্ঞতা ও ধোঁকা প্রাধান্য পায় তা নিষিদ্ধ; যেমন যা মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা বা অজ্ঞাত জিনিস বিক্রি করা।

৮- প্রত্যেক যাতে হারামে জড়িত হওয়ার কৌশল রয়েছে তা নিষিদ্ধ; যেমন 'বাই ঈনা' (بيع العِينة) লেনদেন -এক প্রকার কৌশলগত সূদী লেনদেন- এর ভিত্তিতে লেনদেন।[1]

৯- যা আল্লাহর আনুগত্য থেকে অমনোযোগী করে দেয় তা নিষিদ্ধ; যেমন জুমার দ্বিতীয় আযানের পরে ক্রয়-বিক্রয় করা।

১০- প্রত্যেক যাতে ক্ষতি রয়েছে বা মুসলিমদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে তা নিষিদ্ধ। যেমন হারাম জিনিস বিক্রয় করা এবং এক ভায়ের দামদরের উপর অপর জনের দামদর করা।

একজন মুসলিমের নিকট যখন কোন মাসআলা কঠিন মনে হয়; তখন তিনি

---

[1] ঈনা ক্রয় বিক্রয় হল, এমন একটি লেনদেন যেখানে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো পণ্য বাকিতে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে তা হস্তান্তর করে, অতঃপর সেই মূল্য হস্তগত করার পূর্বে, নগদে কম মূল্যে সেই পণ্য পুনরায় ক্রয় করে নেয়।

ওলামাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং সে ব্যাপারে শরয়ী হুকুম না জেনে উক্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"**...**সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩।]

এ পর্যন্তই সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেকে উপকারী ইলম ও নেক আমলের তাওফীক দান করেন, নিশ্চয় তিনি অতি দানশীল, মহানুভব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

❊❊❊

সূচিপত্র

একজন মুসলিমের জন্য যা জানা অত্যাবশ্যকীয়..2
ভূমিকা..2
প্রথম পরিচ্ছেদ:..3
আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ..3
প্রথম অধ্যায়: ইসলাম (الإسلام) শব্দের অর্থ ও তার রুকনসমূহ: 3
তাওহীদের গুরুত্ব: 3
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই- এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হল: 4
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তসমূহ, তা নিম্নরূপ: 5
মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হল: 6
দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈমান (الإيمان) এর অর্থ ও রুকনসমূহ:..8
১) আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা। এটি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:..9
১- তাঁর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান: 9
২- উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান:..11
৩- আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের প্রতি ঈমান: 13
২- ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান: 20
৩- কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান:..21
৪- সমস্ত রাসূল আলাইহিমুস সালাম এর প্রতি ঈমান:..22
৫) পরকালের প্রতি ঈমান: 23
ক- পুনরুত্থানে বিশ্বাস: 24
খ- হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদান প্রদানে বিশ্বাস:..24
গ- জান্নত ও জাহান্নামে বিশ্বাস: 24
৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান:..25
তৃতীয় অধ্যায়: ইহসান প্রসঙ্গ:..26

চতুর্থ অধ্যায়: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: 27

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ 28

প্রথম অধ্যায়: পবিত্রতা প্রসঙ্গ: 28

প্রথমত: পানির প্রকারভেদ: 28

দ্বিতীয়ত: নাজাসাত: 29

তৃতীয়ত: অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত কাজ করা হারাম: 31

চতুর্থত: পেশাব-পায়খানার আদবসমূহ: 33

পঞ্চমত: ইস্তেনজা করা ও ঢিলা ব্যবহারের বিধানসমূহ: 34

ষষ্ঠত: অযুর বিধানসমূহ 35

সপ্তমত: চামড়া ও কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ করার বিধান: 37

অষ্টমত: তায়াম্মুমের বিধিবিধান 39

নবমত: হায়েয ও নিফাসের বিধান 41

দ্বিতীয় অধ্যায়: সালাত প্রসঙ্গ 42

প্রথমত: আযান ও ইকামতের বিধানসমূহ: 42

দ্বিতীয়ত: সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত: 46

তৃতীয়ত: সালাতের শর্তসমূহ: 48

চতুর্থত: সালাতের রুকনসমূহ: 49

পঞ্চমত: সালাতের ওয়াজিবসমূহ: 54

ষষ্ঠত: সালাতের সুন্নাতসমূহ: 55

সপ্তমত: সালাতের বিবরণ: 58

অষ্টমত: সালাতের মাকরূহ বিষয়সমূহ: 64

নবমত: সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ: 65

দশমত: সাহু সিজদা: 65

একাদশতম: সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ 67

দ্বাদশতম: জামাতে সালাত: 67

ত্রয়োদশতম: সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত: 70
সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি: 71
চতুর্দশতম: জুমার সালাত: 72
পঞ্চমত: জুমুআর দিনের মুস্তাহাবসমূহ: 74
জুমা পাওয়া: 74
পঞ্চদশতম: ওযরগ্রস্ত লোকদের সালাত: 75
ষষ্ঠদশতম: দুই ঈদের সালাত 78
সপ্তদশতম: সালাতুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের নামাজ): 80
অষ্টদশতম: সালাতুল ইস্তেসকা / বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত: 81
উনিশতম: জানাযার বিধি-বিধান: 83
তৃতীয় অধ্যায়: যাকাত প্রসঙ্গ: 86
১- যাকাতের পরিচয় ও তার গুরুত্ব: 86
২- যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ: 87
যে সমস্ত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়: 88
চতুর্থ অধ্যায়: সওম প্রসঙ্গ 99
রমযানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ: 99
পঞ্চম অধ্যায়: হজ ও উমরা প্রসঙ্গ: 106
হজ ও উমরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী: 107
হজের ইহরামের মিকাতসমূহ 109
ইহরাম বাঁধা: 110
উমরাহ প্রসঙ্গ: 114
হজ প্রসঙ্গ: 117
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: 120
পারস্পরিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ 120

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য
নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.